দিবাস্বপ্ন

প্রবোধকুমার সান্যাল

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

উৎসর্গ

সাহিত্যিক, সমালোচক ও সংবাদ-কর্ম্মী

৺সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু

"নয়ন-সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই!"

জুলাই ২৩, ১৯৩৬

কাব্যের ভূমিকা

সন্ধ্যার পরেই লগ্ন। বর আসিয়াছে বিবাহ করিতে; প্রচলিত নিয়মে বিবাহ যেমন করিয়া হয়। আসর বসিয়াছে। দামী গালিচা পাতা, আশপাশে লাল মখমলের গোটা চারেক তাকিয়া, দু'দিকে বড় বড় রূপার ফুলদানিতে দুইটি ফুলের তোড়া, মাথার উপরে ও দেয়ালের চারিদিকে ঝাড়ের আলো জ্বলিতেছে। বরযাত্রীতে বড় ঘরখানা ঠাসাঠাসি। ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র গোলমাল, লুচিভাজার গন্ধ, চুরুটের ধোঁয়া, ফুলের খোসবায়, গানের আওয়াজ, সুলভ রসিকতার ইঙ্গিত, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়ন। ঠিক সাধারণ বিবাহ যেমন করিয়া হয়, অতি সাধারণ প্রথায়।

বরের মাথায় টেরি, কপালে চন্দন, চোখে উৎসাহ, মুখে সংযত হাসি, সর্ব্বাঙ্গে পরিপাটি প্রসাধন। সভায় প্রকাশ, ছেলেটি শিক্ষিত, বিনয়ী, রূপবান এবং ধনী—কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ,

অন্যের চোখের পছন্দে সে বিবাহ করিতে আসিয়াছে। তাহাতে তাহার বিরক্তিও নাই ; এই প্রচলিত প্রথা। মনের খুসিতে ও চাপা হাসিতে বর এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। তাহার পাশেই দু'তিনটি আধুনিক যুবক গান গাহিতেছে।

দরজার কপাটে হেলান্ দিয়া তাহার যে-বন্ধুটি চুপ করিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, বর তাহাকে ইঙ্গিতে হাত বাড়াইয়া ডাকিল। বন্ধুটি কাছে আসিয়া বসিতেই বর হাসি-হাসি মুখে কহিল, বেশ লাগ্‌চে, না রে অমিয় ?

অমিয় তাহার কথাটাকে তাচ্ছিল্য করিয়া কহিল, অত্যন্ত বিরক্তিকর কিনা, তাই তোর ভালো লাগ্‌চে।

তাই বটে, ঠিক বলেচিস্ তুই, বিরক্তিকর! সেই থেকে একটানা ঘ্যান্-ঘ্যান্ করে' চলেছে।

একটু হাসিয়া অমিয় কহিল, তাহলে' নিশ্চয় বাজে কথা বলেচি। আমি যখন বাজে কথা বলি তখন সবাই আমার প্রশংসা করে।

বর তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। কহিল, ওখানে এতক্ষণ চুপ ক'রে' দাঁড়িয়েছিলি কেন ?

দাঁড়িয়েছিলাম, হ্যাঁ—এম্‌নি।

চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলি ? দেখছিলি বুঝি কারো দিকে ?

চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলাম।

বর কহিল, গান শুন্‌ছিলি নাকি ?

না, গান শুন্‌ব কেন ? হ্যাঁ, গানই শুন্‌ছিলাম। বেশ গান।

কাব্যের ভূমিকা

বর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, মেয়েটির আচার-ব্যবহার কি রকম অমিয় ?

অমিয় কহিল, হয় অত্যন্ত সরল, নয় অত্যন্ত রহস্যজনক।

রহস্যজনক ?

না, সরল। মেয়েদের সবই পুরুষের চোখে রহস্যজনক লাগে। অত রহস্য আছে বলেই অত সরল।

পাশাপাশি বসিয়া দুইজনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছিল, কথার আর তাহাদের বিরাম নাই। বর আনন্দে বসিয়া বসিয়া পান চিবাইতেছিল। পান যে তাহার খাইতে নাই এ কথা সে তখন ভুলিয়া গেছে।

একটি কন্যাপক্ষীয়ের লোক গামছা কাঁধে ফেলিয়া কি একটা কাজে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, একজন বরযাত্রী বলিয়া উঠিল, আচ্ছা মশাই, বিয়ের লগ্নটা ঠিক ক'টার সময় বলুন ত ?

লোকটি বলিয়া গেল, এই, সময় প্রায় হয়ে এল আর কি, ঘণ্টাখানেক দেরি, ন'টার পর।

ন'টার পর, অথচ বর এল সাতটার সময়। এতক্ষণ তা হ'লে বসে' বসে'—অমিয়বাবু, চুপি চুপি কি গল্প করছেন বরের সঙ্গে ? পাত হয়েছে কিনা দেখুন না একবার। আপনি ত কন্যেপক্ষের—

অমিয় কহিল, হ্যাঁ এদিকে আমি মাসি, ওদিকে পিসি।

সবাই হাসিয়া উঠিল। যে লোকটি বসিয়া গান গাহিতেছিল,

না বল্‌লে সব পুরুষই সন্ন্যাসী হয়ে যেত’। মেয়েরা পূজায় তুষ্ট হয়, তাই তাদের নাম—দেবী। তুমি দেবে পূজা, সে দেবে প্রসাদ।

এ মেয়েটি কেমন ?

কেমন—এই কথাটাই ত তোমাকে আবিষ্কার করতে হবে! এ মেয়েটি তোমার মুখের দিকে যখন মুখ তুলে তাকাবে, তোমার মনে হবে তুমি জীবনে অনেক অন্যায় ও অনেক পাপ করেছ। মনে হবে তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল, অত্যন্ত ভীরু। এমন একটা চোখের দৃষ্টি, যাতে তোমার মনে হবে তুমি অতিশয় ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, তুমি তার পায়ের কাছে বসবারও যোগ্য নও। এর কাছে এলেই তুমি বারে বারে নিজের দৈন্য অনুভব করবে।

চুপি চুপি বর কহিল, এ কথা তোমার বুঝতে পারলাম না অমিয়।

বুঝতে পারবে, প্রথম যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বুঝবে, তুমি কী। তোমার প্রতি রোমকূপ থেকে তোমার সব লজ্জা ফুটে বেরোবে, তোমার যত পঙ্গুতা, যত গ্লানি—তা’র চোখের দৃষ্টিতে হবে তোমার শুদ্ধি, তোমার নবজন্ম। তুমি যদি সারাজীবন ধরে’ দুঃখ পেয়ে থাকো, এর কাছে বসে’ তুমি সকল দুঃখের কৈফিয়ৎ পাবে, সকল বেদনার। এ মেয়ে তোমার কাছে হবে বিস্ময়!

বিস্ময় ?

হ্যাঁ, বিস্ময়! বিস্ময় আর বিচিত্র! নারীজাতি বহুদিন ধরে’ তপস্যা করেছে একটি নারীর জন্য; সে এই মেয়েটি।

কাব্যের ভূমিকা

শ্রাবণের আকাশ আপন অন্তর্বেদনায় কালো হয়ে উঠেছিল, সেই প্রসব-বেদনায় ফুট্‌ল একটি কেয়াফুল!

বর যেন তাহার কথাগুলির মধ্যে একটি সুস্বাদ গ্রহণ করিতেছিল। বলিল, যাক্ তোকে বহু ধন্যবাদ, তোর জন্যেই এ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া সম্ভব হল'। তোর সঙ্গে পরিচয় ছিল বলেই ত—আচ্ছা, আমাকেও ত চিনিস্, বেশ বনিবনা হবে ত আমার সঙ্গে?

অমিয প্রথমে কথার উত্তর দিল না। সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে বসিয়া একা তাহার মন কোথায যেন উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল। যেদিকে তাকাইয়া ছিল সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। মৃদুস্বরে বলিল, বনিবনা তোমার সঙ্গে নাও হতে পারে!

বিস্মিত হইয়া বর কহিল, সে কি রে?

হ্যাঁ, এর অহঙ্কার একটু বেশী।

অহঙ্কার? সর্ব্বনাশ—

অহঙ্কার সুন্দরী বলে' নয়, সুন্দর বলে'। অহঙ্কার এর কলঙ্ক নয়, অলঙ্কার। কোথাও মাথা হেঁট করে না, তার কারণ এর আছে গভীর আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসই এর অহঙ্কার। তোমার স্ত্রী হবে, কিন্তু তোমার কাছে ছোট হবে না। তুমি যদি তা'র সমান না হতে পারো, অনায়াসে সে তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে। জীবনে সে কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করে নি। প্রেমের জন্য নয়, ঐশ্বর্য্যের জন্য নয়, সংসারের জন্যও নয়।

স্বাধীন মেয়ে নাকি ?

স্বাধীন নয়, সহজ। সহজ হতে পারাই তার মন্ত্র !—চুরুটে আর একটা টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া অমিয় কহিল, তোমার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হবে, বুঝবে, সে নিতান্ত নারী নয়।

নারী নয়, মানে ?

মানে তার মেয়েলিপনা কম। নারীর স্বার্থপরতা তার মধ্যে নেই ; ছোট লোভ, তুচ্ছ ঈর্ষা, ক্ষুদ্র হিংসা, ছলনা ও লালসার ছোট ছোট ইঙ্গিত—এগুলো তার কাছে স্বপ্ন। এগুলো সে জয় করেছে তা নয়, এগুলোকে সে আনতে ভুলে গেছে। আনতে ভুলে গেছে বলেই তার এত অহঙ্কার।

বর বলিল, এই যদি সত্যি হয় তবে সে ত কাদার পুতুল। প্রাণহীন মাটির মূর্ত্তি। তার গায়ে মানুষের রক্ত কোথায় ?

অমিয় হাসিল। হাসিয়া কহিল, সাধারণ নরনারীর দেহে আছে দুই রক্ত, মানুষের আর জানোয়ারের। এর শিরায় আছে শুধুই মানুষের রক্ত। এ মেয়ে হচ্ছে দেবতার আসন।

খুব তেজ আছে নাকি ?

তেজ নয়, জ্যোতি। দিনের আলোতেও তুমি দেখবে তা'র চারিদিক ঘিরে জ্যোতির্মণ্ডল। সেই জ্যোতির্মণ্ডলের কাছে বসলে মাথার মধ্যে তোমার প্রলাপ জমে' উঠ্‌বে। আনন্দে তুমি হবে অস্থির, তোমার হাসি পাবে, কিন্তু কান্নায় গলা বুজে আসবে ; আরামের অসহ্য ব্যথায় তোমার সর্ব্বশরীর থর থর করে' কাঁপবে।

তোমায় মাতাল করবে না, কিন্তু বিভ্রান্ত করবে। তৃপ্তিতে অচেতন হবে, ঘুম পাবে।

বর কহিল, সে ত মোহ!

মোহ নয়, মোহমুক্তি!

একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বর বলিল, এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে অমিয়। তা'র আসল পরিচয়টা চেপে রেখে তুমি অনর্থক ধোঁয়ার সৃষ্টি করছ! আচ্ছা, সে কী ভালবাসে বলো দেখি?

অমিয় বলিল, সে ভালবাসে অশোক আর শিমূল আর জবা-কৃষ্ণচূড়া, রক্ত, সিঁদুর, আল্‌তা, সূর্য্যাস্তের আকাশ, আগুনের আভা, রেলপথের বিপদসূচক আলো।

দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল। বর এক সময় তাহার হাতঘড়িটা ফিরাইয়া সময় দেখিয়া লইল। অমিয় আপন মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, সব চেয়ে কঠিন...সব চেয়ে কঠিন তুমি যখন তাকে ভালবাসার কথা বল্‌তে যাবে। মনে হবে তাকে ভালবাসা জানাবার ভাষা তোমার হাতে নেই, তুমি একেবারে দেউলে হয়ে গেছ। তুমি অনেক কথা ভেবে তার কাছে বসবে, কিন্তু কিছুই বলা হবে না। তুমি যত বড় ঐশ্বর্য্যশালীই হও, তার কাছে মনে হবে তুমি ভিখারী। সব চেয়ে কঠিন তাকে ভালবাসা জানানো, সত্যি, সব চেয়ে কঠিন।

অমিয় চাপিয়া চাপিয়া অলক্ষ্যে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তারপর বলিল, যত দিন যাবে ততই তুমি তার কাছে ছোট হতে থাকবে। একদিন তুমি তার নাগাল পাবে না···তুমি তার পায়ের তলায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তুমি চীৎকার করতে পাবে না, কাঁদতে পাবে না,তোমার পালাবার শক্তি নেই, তোমার টুঁটি টিপে ধরেছে, তুমি ক্লিষ্ট, ক্লান্ত···নিজের কাঙালপনায় তোমার চোখে জল আসবে। মনে হবে জন্ম জন্ম ধরে' ছায়ার মতো ওর পেছনে পেছনে তুমি ঘুরছ, অনাগত বহু জীবন ধরেও তোমাকে ওর অনুসরণ করতে হবে।

তাকে ভালবাসতে গিয়ে এই হবে আমার শাস্তি ?

একটা অতি উগ্র আনন্দ অনুভব করিয়া অমিয় বলিল, হ্যাঁ, এই শাস্তি। এই শাস্তিই পুরুষের প্রেম !

বর কথা কহিল না। অমিয় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, প্রতিদিন তুমি আয়োজন করবে একটি কথা বলবার জন্য, 'তোমায় ভালবাসি'—প্রতিদিন চূর্ণ হবে তোমার সে স্বপ্ন। ভালবাসার কথা শোনবার আগ্রহ যার আছে কিনা তুমি বুঝতে পারবে না, তাকে ভালবাসা জানাবার মতো সাহস তোমার হবে কেমন করে'? সে যে-ঘরে থাকবে, আপন অস্থিরতায় তুমি সে-ঘরে টিঁকতে পারবে না, তোমার দম্ আটকে আসবে। তোমার কেবলই মনে হবে এ মেয়ে সঙ্গীহীন, নিরন্তর কি একটা অনির্দ্দিষ্ট বস্তুর জন্য ধ্যান করছে! তোমার কাছে কেবলই সে জটিল হতে জটিলতর হতে থাকবে।

কাব্যের ভূমিকা

অমিয় চুপ করিল না, মুখখানা আরও সরাইয়া আনিয়া বলিতে লাগিল, ভাঙা খেল্‌নার মতো যদি কেউ তা'র কাছে গড়াগড়ি যায়, সে ফিরেও তাকায় না। নিজের মাথা তোমার চূর্ণ বিচূর্ণ করে' ফেল্‌তে ইচ্ছে হবে, মনে হবে, এ প্রবঞ্চনা, এ অন্যায়—বিধাতার বিরুদ্ধে তোমার যুদ্ধ ঘোষণা করতে ইচ্ছে হবে, আকাশ তোমার চোখে হবে বিষাক্ত, জীবন তোমার কাছে হবে ভয়াবহ বিদ্রূপের মতো···একটিমাত্র নারীর জন্য তোমার চোখে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। অথচ এই দুঃখের মধ্যেও তোমার ভেতরে জ্বল্‌বে আনন্দের অগ্নিশিখা। দুঃখের পাত্র থেকে আনন্দ পান করবে অঞ্জলী ভরে'। তা'র জন্য দুঃখ পেতেও তোমার ভাল লাগবে। একদিন সেই তোমাকে—বলিতে বলিতে গলা ধরিয়া আসিতেই সে হঠাৎ সচেতন হইয়া মুখ সরাইয়া লইল। বর তাহাকে এতক্ষণ ধরিয়া সন্দেহ করিতেছে নাকি?

ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেই সে আর বসিল না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

এমন সময় আসরে একটা সোরগোল উঠিল। কন্যা পক্ষের লোক আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, দয়া করে' উঠুন আপনারা, লগ্ন হয়ে এসেছে।

একসঙ্গে সবাই উঠিয়া হুড়োহুড়ি করিয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বরকে লইয়া গেল সর্ব্বাগ্রে।

বাহিরের নির্জ্জনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অমিয় একবার রাত্রির

আকাশের দিকে তাকাইল। দুই দিকে বড় বড় বাড়ীর মাঝখান দিয়া সে-আকাশ সামান্যই দেখা গেল। তারপর মুখ ফিরাইয়া কাছে একটা বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া সে পা ঝুলাইয়া বসিল। তারপর পকেট হইতে সিগারেট ও দেশালাই বাহির করিয়া সে যখন অন্ধকারে ধরাইল তখন দেখা গেল, তাহার দুই গাল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া আসিয়াছে।

বিস্ময়

দুপুরের রৌদ্রে কলিকাতার পথের কোলাহল তখন কিছু স্তিমিত। যান-বাহনের গতি মন্থর। এমন সময় একটি কিশোর বালক আস্‌ছিল উত্তর দিকে। গায়ে তার একটা মোটা কোট, হাতে একখানা খবরের কাগজ। সম্ভবত অনেক দূর পথ তাকে হেঁটে আসতে হয়েছে—কপালে তার ফুটেছে ঘামের রেখা। উত্তর দিকের রাজপথ ধ'রে কিছুদূর এসে সে একবার থম্‌কে দাঁড়াল, খবরের কাগজখানা খুলে কি যেন একবার দেখে নিল, বোধ হয় কোনো একটা বিশেষ বাড়ীর ঠিকানা, কিন্তু ঠিকানাটা মিলিয়ে সে যেখানে এসে থাম্‌ল, সে একটা দোকান। হ্যাঁ, এই দোকানই বটে। এখানে ফটো তোলা হয়।

দোকানের দেয়ালে নানা লোকের ফটো, নানারূপ ছবির জটলা। যিনি মালিক তিনি বেরিয়ে এলেন। বললেন, কি চাই, ছবি তুল্‌তে হবে?

ছেলেটি সলজ্জভাবে বললে, না, আমি চাই জয়ন্তবাবুকে। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল—তাই দেখে—

ও, হ্যাঁ। আমিই জয়ন্ত। ফটোগ্রাফি শেখবার জন্যে একটা ট্রেনিং ক্লাস খুলেছি। শিখবে কে? তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—ব'লে ছেলেটি নিজেই দোকানের ভিতরে উঠে

এসে দাঁড়াল। একখানা চেয়ার তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, তুমি কাজ কিছু জানো, না নতুন ক'রে শিখবে ?

ছেলেটি হেসে সবিনয়ে মাথা হেঁট ক'রে বললে, কিছুই আমি জানি নে, সবই নতুন ক'রে শিখতে হবে।

বেশ, তাতে লজ্জার কিছু নেই, গোড়া থেকেই শিখবে। এই আমার ষ্টুডিও, এর পেছনে ডার্ক্‌রুম্‌। তোমার নাম কি ভাই ?

সুকুমার।

জয়ন্ত বললে, ওপাশে ট্রেনিং ক্লাস, তিনটি ছাত্র সপ্তাহে দিন চারেক কাজ শিখতে আসে।

সুকুমার দোকানের ভিতরে একবার চোখ বুলিয়ে বললে, কখন্‌ আসেন তাঁরা ?

সন্ধ্যের দিকেই সাধারণত আসে। ঘণ্টা দুই ক'রে শিখলেই মাস ছয়েকের মধ্যে—

সুকুমার বললে, আমার কিন্তু দুপুরবেলা আসাই সুবিধে। যদি কিছু না মনে করেন তা হলে—

কিন্তু আলাদা হয়ে কাজ শেখা কি তোমার পক্ষে সুবিধে হবে ?

আপনি একটু মনোযোগ দিলেই হবে।—সুকুমার হেসে বললে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ হয়ে গেল। ভদ্রতা ও বিনয়ে ছেলেটি সর্ব্বদাই আনত। বয়স তার ষোলো কি সতেরো। স্বাস্থ্যে ও রূপে সে যেন রাজপুত্র। মাথায় ঝাঁপা ঝাঁপা ঘন কালো চুল।

জয়ন্ত বল্লে, প্রথম থেকেই তোমাকে 'তুমি' বলতে সুরু করেছি, কিছু মনে করো না, তুমি আমার ছোট ভায়ের মতন। কিন্তু হ্যাঁ, একটা কথা। মনে হচ্ছে, তুমি সখের জন্য কাজ শিখতে এসেছ, আমি কি তোমার সখ মেটাবার জন্য মেহন্নত করব?

না, না, তা নয়—সুকুমার ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল, এমন কথা ভাবচেন কেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমি এলুম, কাজ শিখে আমি উপার্জ্জন করব মাষ্টারমশাই।

জয়ন্ত সোজা তার দিকে তাকাল। ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, এতে আর সংশয় নেই। বললে, উপার্জ্জন করবে তুমি? তোমারও অভাব আছে নাকি সুকুমার?—তার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিল।

সুকুমার নিশ্চল হয়ে কিয়ৎক্ষণ বসে রইল, আকাশ-পাতাল একান্তমনে ভাবতে লাগল, তারপর এক সময় নিশ্বাস ফেলে বললে, অনেক আশা নিয়ে এসেছি আপনার এখানে। আপনি বিমুখ করলে আমি······আমার আর কোনো উপায় নেই।

আশ্চর্য্য তার কণ্ঠ, এবং তারও চেয়ে আশ্চর্য্য, এই সামান্য কারণে তার চোখের কোনে জলের রেখা এসে দাঁড়াল। এমন স্পর্শাতুর ছেলে কেবল বাংলা দেশেই সম্ভব। দয়া—দয়ায় জয়ন্তর মন স্নেহকোমল হয়ে এল। কতখানি অভাব এবং প্রয়োজন ঘটলে, তবে এই কিশোর বালককে জীবন সংগ্রামে নামতে হয় তাই কেবল তার বার বার মনে হতে লাগল।

ভিতরে এনে জয়ন্ত তাকে ষ্টুডিও দেখাল। পাশেই তার রান্নাঘর, নিজের হাতে সে রাঁধে। এদিকের বারান্দায় ট্রেনিং ক্লাস বসে। ওপাশে ডার্ক্‌ রুম্‌।

এ ঘরে কি হয় মাষ্টারমশাই?

এ ঘরটা অন্ধকার। দেখবে ভেতরটা? এসো, দেখলে তোমার ভয় করবে।

দুজনে ভিতরে ঢুক্‌ল। সত্যই ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কোথাও বিন্দুমাত্র আলো বাতাসের ছিদ্র নেই। দরজাটা জয়ন্ত বন্ধ ক'রে দিল। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, কলিকাতা শহর কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সত্যই ভয় করে। নানা ঔষধ ও য়্যাসিডের সংমিশ্রিত গন্ধ। অন্ধকারে কোথায় ছপছপ ক'রে জলের শব্দ হচ্ছে।

সুইচ্‌ টিপে জয়ন্ত আলোটা জ্বাল্‌ল। আলোটা লাল, গভীর লাল। লাল আলোয় দেখা গেল সুকুমারের ভীত চোখ, ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি। ভয়ার্ত্ত অথচ সচকিত, ঈষৎ কৌতূহলোদ্দীপ্ত। চুলের গোছার নীচে তার কপালে ঘামের ফোঁটা। সে যেন কথা বলবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

এই ঘরে হয় নেগেটিভ্‌ প্লেটের কাজ, বাইরের আলোয় এসব হয় না। সবই শিখবে তুমি একে একে। তুমি কাঁপছ কেন সুকুমার? শরীর ভালো লাগছে না বুঝি? হ্যাঁ, এই ঘরে বেশিক্ষণ থাকলে শরীর অবশ্য একটু খারাপ হয়। এসো বাইরে যাই।

বিস্ময়

আলোটা নিবিয়ে দুজনে বাইরে এল। আঃ বাঁচ্‌ল সুকুমার। আলো দেখে বাঁচ্‌ল। মুখে তার হাসি ফুট্‌ল। কোথায় যেন তার একটি নারী-সুলভ অসহায়তা আছে, একটু উত্তাপেই সে আঁউরে যায়, একটু আলো বাতাসেই সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সে বললে, আমি তবে কাল থেকে আসব মাষ্টারমশাই? কিন্তু এমনি দুপুর বেলায় আসব, কেমন?

জয়ন্ত বললে, সকলের সঙ্গে তুমি তবে কাজ শিখতে চাও না?

তাঁরা আসেন বিকেলে, কিন্তু আমার সুবিধে দুপুর বেলা! দয়া ক'রে দুপুর বেলাতেই আমার ব্যবস্থা করুন মাষ্টার মশাই।

কিশোর কিন্নরকণ্ঠ। তার কথায়, গলার আওয়াজে একটি গভীর লাবণ্য ফুটে ওঠে। তার অনুরোধ এড়ানো বড় কঠিন। সুন্দর দুটি চোখে অদ্ভুত সারল্য। অনভিজ্ঞ, নির্বোধ তার ব্যবহার। এমন ছেলে বাংলা দেশেই সম্ভব।

জয়ন্ত বললে, বেশ, তাই হবে। কাল থেকেই এসো।

সুকুমার নমস্কার ক'রে সেদিনের মতো বিদায় নিল। জয়ন্ত চেয়ে রইল তার পথের দিকে। এমন ছেলে জীবনে কেমন ক'রে উন্নতি করবে তাই সে ভাবতে লাগল। যেন কোনো শাপভ্রষ্ট শিশুদেবতা, বস্তুজগতে ওর উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়। পৃথিবীর ধূলায় ও মলিন হবে ধীরে ধীরে। আঘাতে হবে জর্জ্জরিত, সংঘাতে হবে চুরমার। ডার্ক্‌রুম্‌ দেখে যে ভয় পায়, মুখ তুলে কথা বলতে যে সন্ত্রস্ত,তার সম্বন্ধে কি কোনো আশা করা চলে? নারীজনোচিত

আনম্র কমনীয়তায় যার চরিত্র গড়া, সে অর্ব্বাচীন আজন্ম অকর্ম্মণ্য। জয়ন্ত মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠ্ল। সে স্থকুমারকে আসতে বারণ ক'রে দেবে। পণ্ডশ্রম করবার মতো সময় তার নেই। এই সব দুর্ব্বল ছেলের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা দরকার।

পরদিন যথাসময়ে স্থকুমার এসে দাঁড়াল। জয়ন্ত হেসে জিজ্ঞাসা করল, এই গরমে তুমি কোট গায়ে দাও স্থকুমার? তার ওপর উড়ুনী?

স্থকুমার সলজ্জভাবে বললে, এই আমার অভ্যেস মাষ্টার-মশাই।

কিন্তু পথে হাঁটা নিশ্চয় তোমার অভ্যেস নেই, তোমাকে দেখে তাই মনে হয়। আচ্ছা, তুমি কল্‌কাতার পথ ঘাট চেনো? তোমার ত হারিয়ে যাবার কথা।

কেন বলুন ত?

আমার তাই মনে হয় ভাই। তোমার জীবনে কীই বা অভিজ্ঞতা আছে বলো, কোন্ পথই বা তুমি চেনো?

সচকিত চোখে স্থকুমার একবার তাকাল। পরে নতমস্তকে বললে, কিছু কিছু পথঘাট ত আমি চিনি।

না, তুমি কিছুই চেনো না। তোমার মা বাবা কেমন ক'রে তোমাকে একা ছেড়ে দেন্ বুঝি নে। আর এই ধরো, ভবিষ্যতে তুমি কিই বা করবে। ফটোগ্রাফির ব্যবসা? সবাই ত তোমাকে

ঠকাবে, সব কারবারেই তোমাকে দিতে হবে লোসকান। মানে, তোমাকে আমি নিরুৎসাহ করছি নে ভাই, ভুল বুঝো না।

আবার সুকুমারের চোখ উঠ্‌ল কেঁপে। চোখের পল্লবগুলি ভারাক্রান্ত হয়ে এল। এমন নির্ভরশীল দৃষ্টি জয়ন্ত কখনো দেখে নি। সে তার বক্তৃতা থামিয়ে বললে, যাক্‌ গে, কাজ যখন শিখতেই চাও তখন শেখাব। আমার আর কি বলো, এই ত আমার কাজ। একটু বসো, আমি কিছু খেয়ে নিই।

জয়ন্তর পিছনে পিছনে সে ভিতরে এল। বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে, আপনার এখনো খাওয়া হয় নি? নিজে রাঁধেন আপনি?

জয়ন্ত হেসে বললে, হ্যাঁ, নিজেই রাঁধি ভাই। তুমি ততক্ষণ এই য্যাল্‌বাম্‌টা ভাখো। আমি খুব তাড়াতাড়ি সেরে নেবো।

য়্যাল্‌বাম্‌টা হাতে নিয়ে সুকুমার বললে, আপনি কি দোকানেই থাকেন মাষ্টারমশাই?

হ্যাঁ, ভাই। আর কোথায যাবো বলো। এই দোকানটাই আমার সব, আমার সংসার।

ছবির বইখানা নিযে সুকুমার নাড়াচাড়া করতে লাগল। ঘরখানা বিশৃঙ্খল, আসবাবপত্রের বিন্দুমাত্রও বিন্যাস নেই। গতদিনকার উচ্ছিষ্ট খাদ্যবস্তু একধারে জমা করা, অপরিচ্ছন্ন কতকগুলি বাসন। জয়ন্ত জল এনে সেগুলি নিজেই পরিষ্কার করতে লাগল। তক্তার উপরে কতকগুলো বই কাগজ এবং

কাপড়চোপড় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, জয়ন্তর অলক্ষ্যে একহাতে সুকুমার সেগুলি পরিপাটি ক'রে গুছিয়ে রাখ্‌ল।

সকালবেলা একটা লোক আসে সে-ই জলটল তুলে দিয়ে যায়, বাসনও মাজে। আজ কিন্তু সে আসে নি।—জয়ন্ত বললে।

সুকুমার বললে, আপনি একা থাকেন এখানে ?

হ্যাঁ, একাই থাকি। সংসারে বহু জায়গায় মাথা ঠুকে গেছে; একদিন বহু উচ্চ আশা ছিল ভাই···হ্যাঁ, এখন একাই থাকি। একাই এখন ভালো লাগে।—একটু শীর্ণ হাসি ফুটে উঠ্‌ল জয়ন্তর মুখে।

আপনার মা বাবা নেই ?

সকলের মা বাপ থাকে না সুকুমার।

সুকুমারের কৌতুহলী মন আরো কিছু প্রশ্ন করতে গিয়েও চুপ ক'রে গেল। আহারাদির পর জয়ন্ত বললে, গোড়া থেকেই তুমি শিখবে, কেমন ? আজ তোমার কাছে লেন্‌স্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করব। কালকে ফোকাস্‌ কেমন ক'রে ফেলতে হয় দেখাবো। তুমি কখনো ফটো তোলা দেখেছ ?

দেখেছি, কিন্তু বুঝি নে কিছু।

জয়ন্ত বললে, ফটো তোলা সহজ কিন্তু আলোর মাত্রা-জ্ঞানটা বিশেষভাবে থাকা দরকার। আলো-ছায়ার আন্দাজটা যে যত নিখুঁৎভাবে ধরতে পারবে সে তত বড় আর্টিষ্ট। আলোই এর প্রাণ, এর নামই তাই আলোকচিত্র। লেন্‌স্‌ কাকে বলে জানো ত ?

সুকুমার বললে, না।

লেন্‌স্‌ হচ্ছে পাথুরে কাঁচ। ছবির কৃতিত্ব নির্ভর করে এই কাঁচের ওপর। একে একে তোমাকে সব দেখাব। ফটো তোলার রহস্যটা একবার ভেদ করতে পারলেই দেখবে সব জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে।

সুকুমার বললে, তা হলে অল্পদিনেই শিখতে পারব বলুন?

জয়ন্ত বললে, যন্ত্রের দিকটা শিখতে পারবে অল্পদিনেই, কিন্তু ফটোকে জীবন্ত করতে হ'লে যে সূক্ষ্ম জ্ঞানের দরকার, সে বস্তু আহরণ করতে কিছু বেশি সময় লাগবে ভাই। দাঁড়াও, আগে ক্যামেরাটা বার করি। ক্যামেরা দিয়ে তোমাকে বোঝান সহজ হবে।

জয়ন্ত ভিতরে গিয়ে একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে এল। অধ্যবসায় ও আগ্রহ তার কম নয়। মনে হয় সে যেন আলোকচিত্র-বিদ্যাকে নিজ জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে মিলিয়ে নিয়েছে। সুকুমার যেন তার কাছে উপলক্ষ্য মাত্র, আপনাকে প্রকাশ করাই যেন তার কাজ। কথা বলছে, কিন্তু নিজের কথা সে নিজেই শুনছে। সুকুমারের চোখে জ্ঞানপিপাসার চেয়ে কৌতূহল বেশি। সরল ও আয়ত চোখ তুলে সে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে ছিল।

ক্যামেরাটা বার ক'রে জয়ন্ত একটা চাবি টিপল। বললে, এই কাঁচটার ভিতর দিয়ে ছাখো, এর নাম লেন্‌স্‌। সামনে ওই যে বারান্দার ওপর আকাশ, এই ছাখো তার ছায়া পড়েছে এর

মধ্যে। আর ওই যে দেখছ বড় রাস্তায় লোক চলাচল করছে··· তুমি মাথার চুলগুলো সরাও সুকুমার—

সুকুমার লজ্জিত হয়ে মাথার চুলের গোছা উপর দিকে সরিয়ে দিল। জয়ন্ত হেসে বললে, আর্টিষ্ট হবার আগেই তোমার মাথায় আর্টিষ্টের মতো বড় বড় চুল। তুমি ছোট ক'রে চুল কাটো না কেন সুকুমার?

সুকুমারও হেসে উত্তর দিয়ে বললে, একেবারে পুঁছিয়ে কাটতে মায়া হয়। আর কেটেও ছিলুম মাষ্টারমশাই, কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি চুল বেড়ে ওঠে।

জয়ন্ত তার দিকে চেয়ে বললে, তুমি বুঝি মাথায় কোনো সুগন্ধ তেল মাখো? আমরা ভাই গরীব, কিছুই মাখতে পারি নে।

সুকুমার নতমস্তকে হেসে বললে, আমি কিছুই মাথায় দিই নে মাষ্টারমশাই।

এমনি স্বাভাবিক গন্ধ? আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্য কেন? সুকুমার মুখ তুলে তাকাল।

তুমি ঐশ্বর্য্যের ঘরে লালিত, এ হচ্ছে তারই আভাস।—ব'লে জয়ন্ত আবার ক্যামেরার কাঁচ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু ক'রে দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দোকানের দরজায় কলিং বেল্ বাজ্‌ল। নূতন খরিদ্দার এসেছে। জয়ন্ত বাইরে এল।

সেদিনকার শিক্ষা সেইখানেই সমাপ্ত। ফটো তোলাবার জন্য কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ এসে উপস্থিত হলেন। এবং তাঁদের কাজ

বিস্ময়

শেষ হতে না হতেই বিকালে জয়ন্তর ছাত্রের দল এসে ষ্টো-আবার ঢুকল। সুকুমার এক সময় বিদায় নিয়ে পাশের দরজা দি. বেরিয়ে চ'লে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই সুকুমারের হাত এক রকম পাকা হয়ে উঠল। এখন সে বেশ ছবি তুলতে পারে। জয়ন্তর একটা ফটো সে তুলেছে। ফটো রিটাচ্ করার কাজও সে কিছু শিখেছে! নেগেটিভ প্রিন্টিংটা সে এখনও ভালো জানতে পারে নি। কিন্তু শিক্ষক ইতিমধ্যেই খুসি হয়েছেন তার কাজে। সুকুমারের শিল্পীসুলভ সূক্ষ্ম হাত জয়ন্তকে আশান্বিত করেছে।

সেদিন সুকুমার বললে, আপনি যে কেমন ক'রে এতক্ষণ ডার্ক রুমে কাজ করেন মাষ্টারমশাই · আমি ত পাঁচ মিনিট থাকলেই ঘেমে নেয়ে উঠি। বড় কষ্ট।

জয়ন্ত বললে, অভ্যেস হয়ে গেছে হে। খালি গা নৈলে কাজ করা যায় না। তুমিও তাই ক'রো, জামা খুলে কাজ ক'রো...... তুমি যে কেমন ক'রে ওই মোটা কোট গায়ে দিয়ে থাকো বুঝি নে। গরম লাগে না?

সুকুমার বললে, না, আমারো অভ্যেস হয়েছে।

কিন্তু ঘামে জামাটা নষ্ট হয়ে যায়, তার চেয়ে আমি বলি—

ওই যা, ছবিগুলো শুকোতে দেওয়া হয় নি।—ব'লে সুকুমার

মধ্যে। রুমের দিকে দৌড়ে গেল। জলে ধুয়ে ছবিগুলো ক্লিপে এঁটে হাওয়ায় মেলে দেওয়া তার একটা মস্ত কাজ।

ফিরে এসে সে আবার ক্যামেরা নিয়ে ব'সে গেল।

জয়ন্ত বললে, এসো, আজ তোমার একটা ছবি তুলি সুকুমার।

আমার? না, না, মাষ্টারমশাই, ক্ষমা করুন—সুকুমার ব্যস্ত হয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, আমার ছবি তুলে কাজ নেই, ওটা আমার কিছুতেই ভালো লাগে না। আমি পছন্দ করি নে।

তার ব্যস্ততা ও প্রত্যাখ্যানের চেহারা দেখে জয়ন্ত সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। কোথাও কোথাও এই কিশোর বালকটি যে তার কাছে দুর্বোধ্য এ কথাটা সে অস্বীকার করতে পারে না।

আমার ছবি তুলে আপনাকে লোসকান করতে দেবো না মাষ্টারমশাই।

জয়ন্ত হেসে বললে, যারা চাল-ডাল বিক্রি করে তারাও ত সময়ে ডাল ভাত খায় সুকুমার।

বুদ্ধির দীপ্তিতে এই রূপবান তরুণটির চোখ অকস্মাৎ ঝলমল ক'রে উঠল। সেও হেসে উত্তর দিল, তারা কিন্তু অকারণে চাল ডাল নষ্ট করে না মাষ্টারমশাই। কই, আজ ত আপনি খেতে গেলেন না? চান্ করবেন ত?

না ভাই, আজ গাটা গরম হয়েছে।

গা গরম? জ্বর? তবে উঠেছেন কেন?—সুকুমার আবার ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

জয়ন্ত বললে, এমন হয়। গত বছরে শরৎকালে একবার দেশে গিয়েছিলুম, সেই থেকে ম্যালেরিয়াটা আর ছাড়ছে না।

থাক্, আজ আমি আর আপনাকে বিরক্ত করব না। প্লেট গুলো তুলে রেখে দিই।—ব'লে সুকুমার ভিতরে চ'লে গেল।

কিছু রিটাচিংয়ের কাজ জয়ন্তর হাতে ছিল। আজ সেটা শেষ করতেই হবে। ঘণ্টাখানেক কাজ ক'রে সে উঠ্‌ল, বাকিটুকু কাল সকালের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। যত্ন ক'রে ছবিগুলি গুছিয়ে রেখে সে তার নিজের ঘরে এল। এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে ত অবাক। মাইনে করা চাকরে যা করে না, সুকুমার এমনি করেই তার পরিচর্য্যায় লেগেছে।

এ সব কি সুকুমার?

সুকুমার হেসে বললে, একটিও কথা বলবেন না মাষ্টারমশাই, এসব গুরুসেবা।—ব'লে জয়ন্ত ষ্টোভের উপর সে দুধের বাটি চাপিয়ে দিল।

ঘরটা গুচিয়েছ ভালো কিন্তু বিছানায় অমন ধবধবে চাদর তুমি পেলে কোথা?

আপনার বাক্সে ছিল।

মিথ্যে কথা, বাক্সে আমার যা আছে ভদ্রসমাজে সে সব বার করা যায় না। চাদর তুমি নিশ্চয় কিনে এনেছ।

যদি এনেই থাকি, সে ত আপনার প্রণামী। আমি কি অন্যায় করেছি ?

দুধ আন্‌লে কখন ? আর এই লেবু আর শশা ?

এই মাত্র এনেছি।—ব'লে সুকুমার একপাশে স'রে নিঃশব্দে ব'সে রইল। জয়ন্তর কণ্ঠস্বরে সে ভীত হ'য়ে উঠেছিল।

জয়ন্ত কিন্তু স্পষ্টকণ্ঠে পুনরায় বললে, বাধ্যবাধকতা আমি এড়িয়ে চলি এটা তোমাকে জানানো দরকার ভাই। অতি-আত্মীযতায আমার মন উৎপীড়িত হযে ওঠে সুকুমার।

সুকুমার স্তব্ধ হযে তার দিকে তাকাল। এবং তারপর খালি হাতেই গরম দুধের বাটিটা নামিয়ে রেখে ষ্টোভটা নাবিয়ে সে বাইরে এল। সত্যই এবার তার আত্মসম্মান আহত হযেছে। অনুতাপে লজ্জায় চিত্তগ্লানিতে তার চোখে উত্তপ্ত অশ্রু জমে উঠ্‌ল। অফিস ঘরের টেবিলের সুমুখে দাঁড়িয়ে কপালের চুল সরিযে কোঁচার খুঁটে সে চোখ মুছতে লাগল।

তার ফিরে যাওযাই সঙ্গত। ছাত্রের জীবন ছাড়া আর কোনো জীবনযাপনের যোগ্য সে নয়। তার মনের ফুল এখনো ফল হযে ওঠে নি। পুরুষের প্রথম যে-বয়সটায় স্নেহকোমলতা ও স্পর্শ-কাতরতার আতিশয্য, সেই চিত্তবৃত্তি থেকে সুকুমার আজো উত্তীর্ণ হয় নি। এখনো আসে নি দৃঢ়তা, বলিষ্ঠ তেজস্বিতা—চরিত্রের নিষ্ঠুর স্বাতন্ত্র্যে পুরুষ-সুলভ কাঠিন্য আজো তার জন্মায় নি। তার পক্ষে এখনো কিছুকাল অন্দরমহলে থাকাই যুক্তিযুক্ত।

একজন এসে দোকানের সুমুখে দাঁড়াল। বললে, আমরা ফটো তুলতে চাই।

সুকুমার সহজ হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, দয়া ক'রে কালকে আসবেন। আজ ছবি তোলা হবে না।

কেন? অনেক দূর থেকে এসেছি যে। দেখুন না যদি সম্ভব হয়।

আজ্ঞে না, আজ দোকান বন্ধ।—ব'লে সুকুমার তাড়াতাড়ি ভিতরে এল। বুকের ভিতরটা তার ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে উঠেছে। লোকটার মুখ চোখের চেহারা ভারি পীড়াদায়ক, যেন গোয়েন্দার মতো। বোধ হয় এই লোকটাকেই সে একদিন বাড়ীর দরজায় দেখেছিল। মিনিট দুই পরে সুকুমার একবার উঁকি মেরে দেখ্‌ল, যাক্, লোকটা চ'লে গেছে। ছবি তোলা হবে না এই কথা শুনে তার আগেই চ'লে যাওয়া উচিৎ ছিল। আজ সবাইকে সে দেবে ফিরিয়ে, কিছুতেই সে জয়ন্তকে আজ কাজ করতে দেবে না। হোক না হয় কিছু লোকসান, শরীরের দাম অনেক। ছাত্রদেরও সে আজ ফিরে যেতে ব'লে দেবে। দোকানের দরজাটা ও জান্‌লা দুটো সুকুমার বন্ধ ক'রে দিল।

ভিতরে এসে দেখ্‌লে দুধ খেয়ে জয়ন্ত বিছানায় উঠে চোখ বুজে পড়ে রয়েছে। বোধ হয় জ্বর বাড়ল। কিন্তু সে কী করতে পারে? একটু আগেকার আঘাত ও অপমান এখনো তার মুখে চোখে মাখানো। আর সে মাষ্টারমশায়ের বিরক্তির

কারণ ঘটাবে না। অতি-আত্মীয়তায় করবে না তাঁকে উৎপীড়িত।

কিন্তু তবু এই অসুস্থ লোকটির সম্বন্ধে উদ্বেগ সে সামলাতে পারল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে সে অতি ধীরে জয়ন্তর কপালে হাত রেখে দেখল, বেহুঁস জ্বর। ভীত দৃষ্টিতে সে তাকাল। সে একা। একা মনে হতেই সে দ্রুতপদে গিয়ে আবার সব দরজা জান্‌লাগুলো খুলে দিয়ে এল। তার দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, পা কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

সুকুমার?

কি মাষ্টারমশাই?

ব্যস্ত হোয়ো না, এমন আমার হয। কপালে একটা জলপটি দিতে পারো ভাই?

ছুটে সুকুমার রাস্তায় গেল, পাশের পানের দোকান থেকে বরফ এনে কোঁচার খুঁটে বেঁধে জয়ন্তর কপালে বসাল।

জয়ন্ত বললে, আঃ এইবার জ্বরটা নেমে যাবে। কেউ ডাকতে আসে নি?

এসেছিল, ফিরিয়ে দিয়েছি।

ভালো করেছ, আজ আর কিছু পেরে উঠব না।—ব'লে জয়ন্ত একটু থাম্‌ল। পুনরায় বললে, আমি একটু অন্যায় করেছি ভাই, তুমি আমার ছোট ভায়ের মতন, দোষ নিয়ো না আমার। আঃ, বেশ ঠাণ্ডা।

সুকুমার বললে, যদি কোথাও আপনার আত্মীয়ের কাছে খবর দিতে হয়, বলুন, আমি খবর দিই।

জয়ন্ত হেসে বললে, আত্মীয় আছে কিন্তু অসুখের খবর পেলে তাদের কেউ ছুটে আসবে না সুকুমার।

অনেকক্ষণ ধ'রে সুকুমার তার কপালে বরফ দিল। দেখতে দেখতে জ্বর নেমে গেল, আর বরফের দরকার হোলো না। এতক্ষণ শীত করছিল, এবার জয়ন্তর গরম বোধ হতে লাগল।

রাত্রের দিকে যদি আপনার আবার জ্বর বাড়ে?

যদি বাড়ে কি আর করব বলো।

কিন্তু কাছে কেউ থাকবে না...... এই অসুখ—

হ্যাঁ, সে সমস্যা ত আছেই। তুমি কি আজ থাকতে চাও সুকুমার?

না, না, আমি সে কথা বলি নে—সুকুমার ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পানওয়ালার কাছ থেকে বরফ আনিয়ে আপনার মাথার কাছে রেখে যাবো। আর আমি কাল ভোরেই উঠে আসব আপনার কাছে। ওষুধ আনব কি সঙ্গে?

জয়ন্ত বললে, কুইনিনের বড়ি আমার এখানেই আছে।

সেদিন প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থেকে সুকুমার এক সময় বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

দিবাস্বপ্ন

কলিং বেল্ বাজ্‌ল ঘন ঘন। এত সকালেই খরিদ্দার। জয়ন্ত বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ল। সুকুমার যখন আসে কলিং বেল্ বাজায় না, দরজায় শব্দ ক'রে ডাকে।

আবার ঝন্ ঝন্ ক'রে বেল্ বাজ্‌ল। গলায় সাড়া দিয়ে জয়ন্ত বললে, যাই, দাঁড়ান্।

বিছানাটা তাড়াতাড়ি তুলে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে মুখে একটু জল দিয়ে সে বেরিয়ে এল। জ্বর এখনো তার সম্পূর্ণ ছাড়ে নি। দরজা খুলে সে বললে, কে ?

কিন্তু উত্তর শোনবার আগেই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পুলিশ সার্জ্জেণ্ট, পাহারাওয়ালা ও অন্যান্য অফিসার তার দোকান ঘেরাও করেছে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য।

একজন দেশী অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম জয়ন্ত সেন ?

ঘাড় নেড়ে জয়ন্ত সম্মতি জানাল। তৎক্ষণাৎ একখানা ওয়ারেণ্ট দেখিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হোলো। দ্বিতীয় অফিসার বললেন, দোকান খানাতল্লাসী করব।

জয়ন্ত থতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, অর্থাৎ—?

ততক্ষণে ক্ষিপ্রগতিতে পুলিশের দল দোকানের ভিতরে ঢুকে কর্ত্তব্য সুরু ক'রে দিয়েছে।

এর পরে যা সাধারণত ঘটে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ঘণ্টা তিনেক খানাতল্লাসীর পর জয়ন্তকে মোটরে চড়িয়ে গোয়েন্দা

বিভাগের প্রধান আড্ডার দিকে নিয়ে যাওয়া হোলো। দোকান রইল পুলিশের তত্ত্বাবধানে। জয়ন্তর মনে হচ্ছিল, তার ঘুম এখনো ভাঙে নি, এ একটা নিষ্ঠুর স্বপ্ন, ভয়ানক মায়া!

যথা স্থানে গাড়ী থামিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতরে তাকে নিয়ে যাওয়া হোলো, সমস্ত বাড়ীটা যেন একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র। জয়ন্তকে বিপন্ন হয়ে দাঁড়াতে দেখে কয়েকজন ভদ্র ও বিনয়ী ব্যক্তি তাকে অভ্যর্থনা ক'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন। একটি ভদ্রলোক কিছু খাবার ও চা আনতে পাঠিয়ে দিলেন।

একটা বড় ঘরে একখানা চেয়ারে এসে জয়ন্ত বসল। একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, আপনি বিবাহ করেন নি, না জয়ন্তবাবু?

আজ্ঞে না।

মিষ্টকণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন হোলো, ইচ্ছে করে না বিবাহ করতে? আপনার এই বয়েস—

এ কি উদ্ভট প্রশ্ন! জয়ন্ত বিব্রত হয়ে বললে, এটা নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা!

হেসে ভদ্রলোক পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কখনো 'লাভ্ য়্যাফেয়ার হয়েছিল, জয়ন্তবাবু?

না।

হঠাৎ পিছনের লোহার দরজাটা গেল খুলে। জয়ন্ত সেইদিকে

তাকাতেই আর একজন অফিসার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, একে আপনি চেনেন ?

জয়ন্ত লাফিযে উঠে দাঁড়াল। উন্মাদের মতো বললে, এ—এ ত সুকুমার—

না, ওটা মিথ্যে নাম। এ মেয়েটির নাম আনন্দময়ী ! আপনি তবে চেনেন, কেমন ?

চিনি, চিনি, খুব ভালো ক'রে চিনি।—জয়ন্ত হাঁপাতে লাগল। মাথাটা তার ঘুরতে লাগল, দুলতে লাগল পায়ের তলাকার মাটি।

সুকুমার কখন যে নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে কে জানে। পরণে তার সাড়ী, গায়ে ব্লাউস, হাতে দুগাছি চিকচিকে চুড়ি—এবং সে স্ত্রীলোক। আনন্দময়ী একবার জয়ন্তর দিকে চেয়ে মাথা হেঁট করল, অশ্রুতে তার মুখখানা প্লাবিত।

জামিন আপনি পাবেন না জয়ন্তবাবু। সিরিয়স চার্জ্জ। এই মেয়েটি ডাকাতির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—আপনি একে আশ্রয় দিয়েছিলেন। জানেন আপনি, আনন্দময়ী পলাতক আসামী ? ওকে দেখে মেয়ে ব'লে আপনার মনে হয় নি ?

জয়ন্ত বললে, মেয়ের মতন মনে হোতো কিন্তু মেয়ে ব'লে ত মনে হয় নি।

রূপে, লাবণ্যে, দেহের গৌরবে আনন্দময়ী সমস্ত ঘরটাকে যেন আলোকিত ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চেয়ে অফিসার

বললেন, আজ ভোর রাত্রে রাস্তায় ওকে পুরুষের পোষাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আপনি জানতেন না ও ডাকাতের দলের মেয়ে?

জয়ন্ত এবার উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল। বললে, কেমন ক'রে জানব, কেমন ক'রে বুঝব যা অকল্পিত, যা অভাবনীয়। দেবতার দূত ব'লে যাকে মনে করেছিলুম, দানবের প্রহরী ব'লে তাকে সন্দেহ করব কেমন ক'রে? শুধু কেবল রূপই দেখেছি রহস্যের খোঁজ পাই নি। আপনারা—আপনারা আমাকে যে কোনো শাস্তি দিন, আমি দোষ করেছি, কিন্তু—কিন্তু আমাকে দয়া ক'রে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না···

জয়ন্ত আনন্দময়ীর দিকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

স্মরণীয়

ঐশ্বর্য্যের নানা আড়ম্বর ; তার প্রকাশের নানা ভঙ্গী। সুরার মতো তার প্রকৃতি, উচ্ছ্বসিত হয়ে পাত্রের সীমানাকে অতিক্রম করাই তার রীতি। নৈলে সামান্য গৃহপ্রবেশকে উপলক্ষ্য করে' এমন অসামান্য সমারোহ দক্ষিণ কলিকাতায় কে আর কবে দেখেছে ? বিবাহ নয়, প্রীতিভোজ নয়, জন্মতিথি-উৎসব নয়—কেবলমাত্র গৃহপ্রবেশ। চিরস্মরণীয় গৃহপ্রবেশ।

পথের জনতা বিস্ময়-বিমুগ্ধ, হতচকিত। সম্মুখে প্রস্তরময় সিংহ-মূর্ত্তিখচিত লাটভবনের প্রবেশ-পথের মতো বিশাল দরজা ; তার পরেই লাল কাঁকরের অন্দরগামী পথের দু'ধারে পুষ্পলতার কেয়ারি করা বিস্তীর্ণ উদ্যান, এবং তারপরেই মার্বেল পাথরের পেটির উপর তাজমহলের মতো বিরাট অট্টালিকা। আলোকমালায় সুসজ্জিত সুবিপুল প্রাসাদ।

রাস্তার ধারে যে অসংখ্য মূল্যবান মোটরগুলি অপেক্ষা করে' রয়েছে তাদের থেকে সহজেই জানা যায় আজকের আসরে নগরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণের একত্র সমাবেশটি কেমন। স্যার গণেন্দ্রনাথের অবিসম্বাদী জনপ্রিয়তা সকলকে নির্বিচারে আকর্ষণ করে এনেছে।

সোপান বেয়ে উঠে এলেই বিস্তৃত কক্ষ, কক্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঢালা বেগুনী মখমলের বিছানা। তারই উপর যে নরনারীগুলি পরস্পর উচ্ছল কথালাপে মশ্‌গুল, মনে হয়

তাঁদের প্রত্যেকেই সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অবারিত আশীর্ব্বাদ চিরজীবন ধরে পেয়ে এসেছেন ; অজস্রতা ও প্রাচুর্য্যের সহিত তাঁদের প্রতি-দিনের অচ্ছেদ্য পরিচয়। আসরের মধ্যস্থলে গোলাপ-জলের একটি কৃত্রিম ফোয়ারা, ভিতর থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কেমন একটি বহুবর্ণ-আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেয়ালের নীচে-নীচে কয়েকটি উজ্জ্বল পিতলের আধারে গুটিকয়েক সূর্য্যমুখী ও ক্রিসেন্‌থিমামের চারা বসানো—ফুল ফুটে রয়েছে। টুকরো হাসি, মধুর সৌজন্য, ছোট ছোট পরিচয়ের আদান-প্রদান, চুড়ির আওয়াজ, সাড়ীর শব্দ—প্রাণের চাঞ্চল্যে কক্ষটি মুখরিত। চটুল এক একটি রসালাপ মাঝে-মাঝে মুখ থেকে মুখে ঘোরাফেরা করছে।

গানের আসর বসেছে। লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন বিখ্যাত ঠুংরী-গায়ক সুদর্শন মিশ্র। আর কলিকাতার যাঁরা বহু-পরিচিত গায়ক-গায়িকা, তাঁদের প্রায় সকলকেই দেখা যাচ্ছে। রেকর্ড আর রেডিয়োতে গান গেয়ে জনসাধারণকে যাঁরা সম্মোহিত করেছেন, পুলকিত ও মুগ্ধ করেছেন—তাঁদের সকলকে একত্রে পাওয়া স্যার গণেন্দ্রনাথের পক্ষে কঠিন হয় নি। কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুলগুলি আজ এই উৎসবের পাত্রে থরে থরে সাজানো।

এদিকে গানের আসর, ওদিকে আলাপ ও আপ্যায়ন। অমুক ষ্টেটের রাজকুমারী এসে পৌঁছলেন, তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে' এনে বসানো হলো ; বিনয়-নম্রতায় অবনতমুখী মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঐশ্বর্য্যের গৌরব বিকীর্ণ হচ্ছে। অমুক জষ্টিসের

বাড়ীর মেয়েরা বসেছেন আলোর ঠিক নীচেই; একটি মেয়ের কানের দুটি দুল বর্ষা-মেঘের বিদ্যুৎলতার মতো এক একবার ঝল্‌সে উঠ্‌ছে। গৃহস্বামিনী এসে মাঝে মাঝে অতি-ভদ্রতায় একজনের সঙ্গে আর একজনের পরিচয় করিয়ে দিযে চলে' যাচ্ছিলেন। রাধা-নগরের অমুক জমিদার সস্ত্রীক এসে প্রবেশ করলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করার কী ব্যাকুলতা—বয়সে তিনি এখনো তরুণ; তাঁর গায়ে-জড়ানো উড়ানীর সাচ্চা-জরির প্রান্তটা কোষমুক্ত তলোয়ারের ফলকের মতো ঝলমল করছে। স্ত্রীর চোখে শ্বেত-পাথরের মোটা চশমা, বাঁ-হাতের চুড়ির সঙ্গে একটি বহুমূল্য রিষ্ট্‌ওয়াচ, মুখে তাঁর সুকৌশল টয়লেটের চাকচিক্য। দীপ্তশ্রী যৌবনের জটলা; কোথাও একান্তভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না, সুসজ্জিত প্রদর্শনীর মতো চোখ বুলিয়েই চলা যায়।

'আপনিই ডক্টর সেন? আজ্ঞে হাঁ। কাউন্সিলে আপনার বক্তৃতাটা নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছে কাগজে দেখলুম। 'Twas delivered very passionately.'

ডক্টর সেন সবিনয়ে একটুখানি হাসলেন।

একটি যুবক অতি মৃদুকণ্ঠে আলাপ করছেন এক তরুণীর সঙ্গে —তাঁদের চারিটি চক্ষু মুখের চেয়েও মুখর—সম্ভবত অনেকদিন পরে দেখা, প্রভাত-সূর্য্যের মতো ক্ষণে ক্ষণে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠ্‌ছে তাঁদের মুখ। আসরের মাঝখানে না হ'লে তাঁরা হয় ত আরো নিকটতর হয়ে কথা বলতেন।

'শুনলুম নাকি ছবি আঁক্‌চেন আজকাল ? আমাকে খানকয়েক যদি দেন, বম্বের আর্ট একজিবিশনে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

তরুণীটি লজ্জায় রক্তাভ হয়ে বললেন, ছবি এমন কিছু হয় না, আপনি যদি একদিন আমাদের ওখানে যান তা হলে—'

'থ্যাঙ্কস্, যাবো একদিন।'

এমন সময় গণেন্দ্রনাথ এসে ঢুকলেন একটি মেয়ের কাঁধের উপর হাতের ভর দিয়ে। মেয়েটির বয়স বছর আঠারো, পরণে সাড়ী নয়, হাঁটু পর্য্যন্ত মস্‌লিনের একটি স্কার্ট কটি থেকে নেমে এসেছে, উপরে বডিস্, সুডোল দু'খানি পা শাদা রেশমি মোজায় ঢাকা। মাথার চুল বব্ করা। গণেন্দ্রনাথ অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় করিয়ে দিলেন, মেয়েটি হেসে-হেসে নমস্কার বিনিময় করতে লাগলো। নিজের শরীর সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন নয় দেখে অনেকেই বোধ করি একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার নাম নমিতা। গলা থেকে স্কার্টের উপরে পর্য্যন্ত একটি বেণী-পাকানো কালো চামড়ার চাবুক ঝোলানো— শোনা গেল, নমিতার ঘোড়ায় চড়ার কৃতিত্ব দেখে কোন্ এক মাড়োয়ারী লক্ষপতি তাকে একটি সোনার তরবারি উপহার পাঠিয়েছিলেন। পা মুড়ে হাঁটুর উপর চেপে নমিতা বসে' পড়লো, স্কার্টটা একটু টেনে দিল।

সুদর্শন মিশ্র গান সুরু করলেন। খান্‌সামা রূপার ট্রে-তে করে' সুস্বাদু সরবৎ বিলি করছিল, মাঝে মাঝে আসছে সিগারেটের

থালা, বর্ম্মা চুরুটের বাণ্ডিল। স্ক্রীণের ফাঁকে পাশের কক্ষে ডিনারের টেব্‌ল্‌ সাজানো হচ্ছে, কাঁচের প্লেট্‌ ও চামচের আওয়াজ আসছে। এক একবার কাঁচের গ্লাস ভাঙার মতো উৎক্ষিপ্ত হাসির শব্দ উঠেই আবার থেমে যাচ্ছে—মেয়েদের হাসির শব্দই আলাদা! মিশ্রজীর গান আরম্ভ হবার পর সকলের মনোযোগ সেইদিকে আকৃষ্ট হোলো। বাস্তবিক, গান তিনি ভালই গান্‌।

প্রধানত গানেরই আসর বলা যেতে পারে; কারণ, একজনের পর একজন গান গেয়েই যেতে লাগলেন, থামবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

'কই হে, সুনীল কই, এসো এসো—ধরো হারমোনিয়ম্‌।' ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণ বসেছিল সুনীল, কুণ্ঠিতকণ্ঠে বল্‌লে, 'আমার যে ভাঙা গলা যতীনদা'—

'ওতেই হবে, আমরা কিছু মনে করবো না—এসো।—কি হে, একে চেনো ত—সুনীল চৌধুরী! চেনো না তোমরা সুনীল চৌধুরীকে? ওয়ান্‌ডার! সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কথাটার মানে জানো ত? সুনীল হচ্ছে তাই, ভারসাটাইল্‌ যিনিয়স্‌। গাও সুনীল, তোমার সেই বাগেশ্রীর আলাপটা ধরো।'

সুনীল অত্যন্ত বিব্রত হয়ে সরে এলো। প্রতিবাদও খাটবে না, অক্ষমতার ক্ষমাও মিল্‌বে না।

'আজ মনে পড়ছে সেই সুনীল চৌধুরীকে, ঘিয়ের দোকান ক'রে যে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসে থাকতো; আশ্চর্য্য হয়ো না

তোমরা—তারপর দিল চপ-কাট্‌লেটের হোটেল—তারপর কি সুনীল?'

আসরের সবাই উৎকর্ণ হয়ে এদিকে তাকালো। সুনীল বললে, 'তারপরেই ত গেলাম চাষ করতে।'

'মার্ভেল্যস্—আরে, এই যে মনোরমা এসেছ। আচ্ছা, আগে হোক মনোরমার গান, তারপর সুনীল—সুনীল দেবে ফিনিশিং টাচ্। মিশিরজি, আপ ঠেকা দেয়েঙ্গে?'

'মেহেরবাণী।' বলে মিশ্রজি বাঁয়া-তবলাটা টেনে নিলেন।

মনোরমার গান হয়ে যাবার পর যতীনবাবু আবার সুনীলকে ধরে বসলেন। সুনীল বললে, 'গত জন্মের শত্রুতার প্রতিশোধ এ-জন্মে নিচ্ছেন যতীনদা?'

'কেন, কেন?'

'আজ আমাকে জবাই না করে ছাড়বেন না দেখছি।'

'লজ্জা হচ্ছে গাইতে? শুনুন সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র-মহিলাগণ, সুনীল চৌধুরীর লজ্জা!—কি হে, তোমার সেই দুর্দ্ধর্ষ চেহারাটা গেল কোথায়? কোথায় গেল তোমার যৌবনের সেই বেপরোয়া এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌গুলো? বাঙালীর ছেলেদের শক্তির বয়েসটা বড় ক্ষণস্থায়ী। সুনীল, আজো তোমার সেই আজগুবি য়্যাম্‌বিশ্যন্‌গুলোর ফর্দ্দটা মনে পড়ছে হে, তোমার মতো ইন্‌ট্যারেষ্টিং লাইফ্ আমি দেখি নি।'

মেয়েরা ওদিকে সকৌতূহলে মুখ চাওয়াচায়ি করছিলেন।

অথচ যাকে নিয়ে এই আলোচনা, সে-ব্যক্তিটি নিতান্ত নির্ব্বিকার হয়ে সব শুনে চলেছে, চোখে মুখে তার আত্মপ্রসাদের চিহ্নমাত্র নেই। একটি ভদ্রমহিলা বোধ করি মনে মনে উত্যক্ত হয়ে এবার জানালেন, 'ভূমিকা ত অনেক হোলো, এবার গান হোক যতীনবাবু ?'

'হবে,দাঁড়ান্।' যতিনবাবু বললেন,'ভূমিকার পর উপক্রমণিকা।'

অনেকেই একটু শোভন হাসি হাসলেন। মিষ্টার রায় বললেন, 'আপনার গৌরচন্দ্রিকার জন্য ধন্যবাদ।'

অতিথি এবং অভ্যাগতর সংখ্যায় চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গণেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী এসে এইবার সকলের সহিত যোগদান করলেন। বহু নরনারীর সমাগমে যে বিশৃঙ্খলাটুকু দেখা যাচ্ছে তাকে ঠিক জনসাধারণের হট্টগোল বলা চলে না, সেটুকু সুশোভন ও সুরুচিপূর্ণ, তার মাত্রার সীমা আছে। দুই তটের মধ্যে কোনো কোনো নদীর প্রবাহকেও একটু উচ্ছৃঙ্খল হ'তে দেখা যায়।

হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে সুনীল বাজাতে সুরু করলো। প্রথমেই ধরলো বাগেশ্রী। জনতা স্তব্ধ। ওধারে মেয়েদের কানা-কানি কথালাপ বন্ধ হোলো। নমিতার মুখে-চোখে আর চাঞ্চল্য নেই। জষ্টিসের বাড়ীর মেয়েরা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বাইরের পরদার ফাঁকে খানসামাটা পর্য্যন্ত উঁকি মারছে। যতীনবাবুর মুখে আর কথা নেই। মিশ্রজী তবলা বাজিয়ে

চলেছেন ! বর্ষার সজল রাত্রি ছাপিয়ে বাগেশ্রীর সকরুণ রাগিণী যখন আহত পক্ষীশাবকের মতো দেযালে-দেয়ালে প্রতিহত হয়ে বেড়ায় তখন তার বর্ণনা নেই। সঙ্গীতের সাধনা সুনীল করেছে বটে। নীরব প্রশংসায় সবাই তাকে অভিনন্দিত করলেন।

গান থামলো। বৈদ্যুতিক পাখার কিচ্ কিচ্ শব্দ ছাড়া ভিতরে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। এমন সময় যতীনবাবু নবাগতা এক তরুণীকে দেখে সচকিত হয়ে উঠলেন।

আরে বনলতা কতক্ষণ ? তুমি ত আজকের হীরোয়িন্— এসো, এসো ; সবাই আজ অপেক্ষা করে' রয়েছেন তোমার গানের জন্যে—আমি ত প্রায় তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম।'—বলে যতীনবাবু সুনীলের সঙ্গে বনলতার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এই সর্ব্বজনপ্রিয়া সঙ্গীত-রাণীর দিকে তাকিয়ে আসরে একটি আনন্দ-গুঞ্জন উঠ্‌লো।

বনলতা বললেন, 'আপনার কথা শুনেচি আমি যতীনদার কাছে।'

কী বিনীত, কী লাবণ্যবতী মেয়ে! রাজকন্যার মতো যেন গৌরব-গর্ব্বিতা! প্রথমটা সুনীলের মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। ভিতরটা তার অস্থির আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। এই সুবিখ্যাত বনলতা ? যার কণ্ঠসঙ্গীত বাংলাদেশে এনেছে যুগান্তর ? রাত্রির পর রাত্রি সুনীল যাকে স্বপ্নে দেখেছে ? পথে, ঘাটে, লোকের মুখে, বহু গানের আসরে, রেডিয়ো ও রেকর্ডে,

দেশে-বিদেশে যার সর্ব্বজনসম্মত খ্যাতি—এই সেই বনলতা দেবী? গালে একটি ছোট কালো তিল, চোখে চশমা, সিঁথিতে সিঁদূরের আভাস, পরিচ্ছন্ন দাঁত, আলুথালু দেহভঙ্গী—অপলক চোখে সুনীল তাকালো। প্রাণের সমস্ত আনন্দ তার চোখের দৃষ্টির উপরে থর থর ক'রে কাঁপচে। আজ তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

কথা বলতে গিয়ে তার গলা অস্বাভাবিক রকম কেঁপে উঠ্‌লো; আজ যদি তার দুর্ব্বলতা একটু প্রকাশ পায় তবে এই শিক্ষিত ও সুসভ্য সম্প্রদায় তাকে যেন মার্জ্জনা করে। ধীরে ধীরে বললে, 'আপনার গানের আমি বিশেষ অনুরাগী।'

বনলতা সলজ্জ একটু হাসলো। অগণিত নরনারীর প্রশংসা সে শুনেছে, সুনীলের অনুরাগে তার কী আসে যায়? সকল প্রশংসার অতীত সে, শ্রদ্ধা ও সম্মান লুটোচ্ছে তার পদপ্রান্তে কাঙালের মতো, যশ ও খ্যাতি তার ক্রীতদাস।

হেসে বনলতা বললেন, 'আপনার গানও শুনেচি খুব ভাল, যদিও এখনো শোনবার সৌভাগ্য হয় নি।'

আবার সুনীলের কণ্ঠরোধ হয়ে এল। তার গানের কথা শুনেছেন বনলতা? অখ্যাত কোন্‌ এক নগণ্য মানুষ সে, তার উপরেও পড়েছে সূর্য্যের কিরণ? তার ইচ্ছা হোলো আনন্দে চীৎকার করতে, উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠ্‌তে। সে কি এবার নৃত্য করবে? উঠে দাঁড়িয়ে বিদীর্ণ কণ্ঠে সকলকে শুনিয়ে দেবে তার এই উল্লাস?

মনে হচ্ছে, তার শরীরের প্রত্যেকটি রোমকূপ পর্য্যন্ত হর্ষে ও পুলকে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ হয়ে উঠ্‌ছে।

অনেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন বনলতার গানের জন্য। আর কারু সবুর সইছে না। বনলতার জন্য ব্যাকুল তারা নয়, তার গানের জন্য। অকৃতজ্ঞ জনসাধারণ! সুনীলের ইচ্ছা হোলো, তাঁকে মানা ক'রে দেব গান গাইতে। কতটুকু বোঝে ওরা বনলতাকে? শিল্পীকে কতটুকু সম্মান দিতে জানে জনসাধারণ?

লোকের আগ্রহ বেড়েই চলেছে। যতীনবাবু বললেন, 'তোমার ভৈরবীটা ধরবে নাকি?'

বনলতা বললেন, 'বাবারে বাবা, নেমন্তন্নে এলুম এখানেও গান গাইতে হবে যতীনদা? শরীরটা যে আজ ভাল নেই। তা ছাড়া আমায় যেতে হবে এখুনি।'

'কোথায়?'

'আর একটা নেমন্তন্ন আছে বালীগঞ্জে।'

'তবে যা হোক একটা গেয়ে চলে যাও; বলে' যতীনবাবু হারমোনিয়ম্‌টা তাঁর দিকে ঠেলে দিলেন।

আজকের এই জাগ্রত স্বপ্নময় রাত্রি সুনীলের যেন আর না পোহায়। প্রস্তর মূর্ত্তির মতো সে বসে রইলো অপলক চোখে। গান যে এমন করে গাওয়া যায়, তার আবেদন হৃদয়কে যে এমন করে' দ্রবীভূত করে—এ সুনীলের জানা ছিল না। শ্রোতার দল মূঢ়, নিমেষ-নিহত, বিভ্রান্ত। সবাই শুনছিল গান, সুনীল তাকিয়ে

ছিল তাঁর কণ্ঠের দিকে, মুখের দিকে, তাঁর সুকোমল অঙ্গুলি-চালনার দিকে। তার দেহমুক্ত আত্মা যেন অনন্ত আকাশের অকূল ও অতল আলোকের প্লাবনের মধ্যে পথহারা হয়ে বিচরণ করছে। ধন্য সে, কৃতার্থ সে! দেবীর দর্শন পেয়ে পূজারীর তপস্যা সার্থক হয়েছে।

গান শেষ করে' মধুর হাসি হেসে সকলকে বিনীত নমস্কার জানিয়ে বনলতা উঠে যখন বেরিয়ে চলে গেল, মনে হোলো, কক্ষের সমস্ত প্রদীপগুলি নিবে গেছে, তারপর আসরে থাকার আর কোনো প্রয়োজন রইলো না; সুনীল এক ফাঁকে উঠে বাইরে এল। তখন বেশ রাত হয়েছে। লাল কাঁকরের পথ পার হয়ে সে সোজা পথে এসে নামলো। এবার তার নিতান্ত একাকী হওয়ার প্রয়োজন, নিঃসঙ্গ হয়ে সে সমস্তটাকে একবার অনুভব ক'রে নেবে; মাথার উপরে বর্ষার আকাশে মেঘ করেছে, একটিও তারা দেখা যাচ্ছে না। পথের অনুজ্জ্বল আলোগুলি অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে যেন আপন কর্ত্তব্য পালন করছে। সম্মুখের এই আলোকমালার অত্যুগ্রতাকে বর্জ্জন ক'রে সে কিছুদূর এগিয়ে গেল, এবার তার ভাল লাগছে অন্ধকার, কোমল নিবিড় অন্ধকার। পথের ধারে চারিদিকে তাকিয়ে একবার সে দাঁড়ালো, সব যেন তার চোখে নূতন ঠেক্‌ছে, কিছুই সে চিন্‌তে পারছে না—পথগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে জড়াজড়ি ক'রে একাকার হয়ে রয়েছে। ইহলোক থেকে সে বিদায় নিয়েছিল, ফিরে এসে কিছুই আর

পরিচিত মনে হচ্ছে না। আবার অনেকদূর হাঁট্তে হাঁট্তে সে চললো, হাঁট্তে তার ভাল লাগছে আজ, তার এই একান্ত একাকিত্বকে ঘিরে আজ যেন গ্রহে-গ্রহে, তারায়-তারায়, সমগ্র সৌর-সভায় চল্ছে আনন্দ-কলরব, বিচিত্র উৎসব।

এক সময় সে গাড়ীতে চড়ে' বসলো। স্বপ্নের ঘোরে কতক্ষণ তার পার হয়ে গেছে, এবার সে বেশ সজাগ হয়ে শক্ত হয়ে বসলো। গাড়ী যখন দ্রুত চল্চে তখন তার চোখের উপর দিয়ে ঘর-বাড়ী, দোকান-বাজার, সিনেমা-পার্ক, সমস্তগুলিই আপন আপন সাজ-সজ্জার উপরে একটুখানি স্বপ্নের রং মেখে একটি অবাস্তব পরিচয় দিয়ে ছায়াচিত্রের মতো সরে যেতে লাগলো। অনেকক্ষণ এমনি ভাবে চলবার পর সে হঠাৎ চকিত হয়ে দেখলো, পথ ভুল হয়েছে। তাড়াতাড়ি গাড়ী থামিয়ে সে নেমে পড়লো। ছি ছি, আজ তার হয়েছে কি? তার এই সুলভ আত্ম-বিস্মৃতির নভেলিয়ানা অন্তত আজকের রাত্রে মানায় না!

হেঁটে হেঁটে প্রায় রাত্রি বারোটা নাগাৎ সে অন্ধকারে বাড়ীর দরজার কাছে এসে পৌছলো। সহরের একপ্রান্তে এদিকটা সন্ধ্যার পরেই নিশুতি হয়ে যায়। আন্দাজে দরজায় হাত বুলিয়ে সে কড়া নাড়লো। কিয়ৎক্ষণ পরে দরজা খুলে যেতেই সে দেখলো, কেরোসিনের ডিবে হাতে স্ত্রী এসে ঘুমচোখে দাঁড়িয়ে।

'অসুখ-বিসুখের ঘর, এত রাত অবধি বাইরে থাকলে কি চলে?'

দিবাস্বপ্ন

সেই পরিচিত বিরক্তিকর কণ্ঠস্বর! একটি সুরের তার ছিঁড়ে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। উত্তর দেবার প্রবৃত্তি তার হোলো না, কিন্তু দু'পা গিয়ে সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে সে অস্বাভাবিক তিক্তকণ্ঠে বললে, 'গায়ে কি তোমার একটা ছেঁড়া জামাও জোটে না?'

আর সে দাঁড়ালো না, হন্ হন্ করে' উপরতলায় উঠে গেল। ঘরে ঢুকে সে আলোটার কাছে এসে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো। পুরোনো আলোটার চিম্‌নীতে ভুসো লেগে কদর্য্য হয়ে উঠেছে, তবু সেই স্তিমিত আলোয় এতক্ষণে সে দেখলো, পরণের জামা-কাপড়গুলি তার নিতান্তই ময়লা, এইগুলিই সে জড়িয়ে রয়েছে সন্ধ্যা থেকে।

নিতান্ত সাধারণ স্ত্রী, অসুস্থ পুত্রকন্যা, দরিদ্র গৃহসজ্জা, বায়ুলেশহীন ক্ষুদ্র ঘর—আজ সকাল পর্য্যন্ত এদের নিয়ে সে খুসিই ছিল, কিন্তু আজকের রাত্রে সত্যি এসব আর কিছু ভাল লাগছে না, কে যেন সবলে তার টুঁটি টিপে ধরেছে, একটি কঠিন অসন্তোষ রি রি করে' জ্বলছে তার সর্ব্বাঙ্গে। জীবনে বারে বারে মাথা তুলতে গিয়ে বারে বারে কেন ঘটেছে তার পরাজয়—আজকের বিনিদ্র রাত্রে বসে-বসে এই কথাটাই সে একবার নাড়াচাড়া ক'রে দেখ্‌বে।

হয় ত এমনিই হয়। মানুষের জীবনে মাঝে-মাঝে আসে দুর্বোধ্য মুহূর্ত্ত, তখন বোঝা যায় না কোথা দিয়ে গেল বুক ভেঙে, কোথা দিয়ে প্রবেশ করলো মর্ম্মান্ত অতৃপ্তি!

ভয়ত্রস্তা স্ত্রী একসময়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছে, সে দিকে সুনীল লক্ষ্যও করলো না—কেবল অনেকক্ষণ পরে আলোটা নিবিয়ে সে নিঃশব্দে জান্‌লার ধারে বসে রইলো। দিক্‌দিগন্ত তখন মেঘাবৃত, অমা-রজনীর মতো কালীমাখা অন্ধকার, টিপ্‌ টিপ্‌ করে' বৃষ্টি পড়ছে !

কাঁচের আওয়াজ

'কুমীরের মতন দাঁত বা'র করবেন না মশাই: আপনার হাঁ দেখ্‌লে ভয় করে। কলের পাইপটা সারিয়ে না দিলে বাড়ী-ভাড়া পাবেন না।' গিরীন বল্‌তে লাগলো—'মাসকাবারি রক্ত চুষে খাওয়া এবার আপনার চলবে না—'

এই কথা বল্‌তে বলতেই বাধলো বাড়ীওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া। এবং প্রতিমাসের পয়লা তারিখে এমনি ঝগড়াই বেধে আসছে বহুকাল থেকে। হাতাহাতি হবার উপক্রম হতেই আর-সবাই এসে দু'জনকে জাপ্‌টে ধ'রে থামালো। তারপর পরস্পরের বিদীর্ণ কণ্ঠের আস্ফালন এবং গালাগালি।

ভূদেববাবু ব'লে চললো, 'ঢের ভাড়া জুটে যাবে আমার, গোয়াল খোলা থাক্‌লে বৃষ্টির দিনে অনেক গরু এসে ঢুক্‌বে। আবার লম্বা-লম্বা কথা। জানি নে আপনার কেচ্ছা? মদ খেয়ে ঢলাঢলি—মেয়েছেলে নিয়ে—ব'লে দেবো এদের, বড় বাজারের সেদিনের কাণ্ডটা? বস্তিবাটি থেকে সেবার পুলিশে ধ'রে এনেছিল কেন, ব'লে দেবো সকলের সাম্‌নে?'

গিরীনের চোখ দুটো রাগে তখন ধক্‌ধক্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে সে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগলো, 'যদি বা বলো তবে তোমায় এখুনি কুচিয়ে কেটে

ফেল্‌বো…অনেক খুন করেছি আমি…ছেড়ে দাও তোমরা, ছেড়ে দাও বল্‌ছি। কি বল্‌বি বল্—আমি চোর, আমি চরিত্রহীন—এই ত? আর তুই? তুই যে নীচ, হীন, রক্তপিশাচ—'

কিন্তু কেউ তা'কে ছেড়ে দিল না। কেন ছেড়ে দিল না, এবং দিলেই বা কী ঘটনা ঘট্‌তো সে-আলোচনা নিষ্ফল।

লোকজন দাঁড়িয়ে গেছে: মাসে একবার ক'রে দাঁড়িয়ে যায়। যারা পথের ওপারের ফুট্‌পাথ দিয়ে দেখে-দেখে চ'লে যায়, তারাও জানে এ-বাড়ীতে মাঝে-মাঝে কেন লোকজন দাঁড়ায়। গিরীনের গলার আওয়াজ পথের পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত জানে।

শেষকালে এক বৃদ্ধা এসে সেদিন থামালো দু'জনকে। একজন নাছোড়বান্দা জমিদার, আর-একজন দুর্দ্ধর্ষ প্রজা। বৃদ্ধা দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে মিটিয়ে দিয়ে বললে, 'গালাগালি ত করলে বাবা এতক্ষণ, এবার একটু গলাগলি করো দিকি? বুকের ছাতি বাবা তোমাদের দু'জনেরই বড় নয়।'

তা বটে। গিরীন এতক্ষণ এটা বুঝতে পারে নি; কেমন করেই বা পারবে, বুঝতে সে জীবনে কিছুই পারলো না। ফস করে' অত লোকের মাঝখানে গলা নামিয়ে বললে, 'এ-বাড়ীতে আপনারা কি নতুন এসেছেন বুড়ি-মা? বেশ, বেশ…ওহে ভূদেববাবু, কাল এসো, দেবো তোমার ভাড়াটা চুকিয়ে—আরে, তোমরা সব দাঁড়িয়ে আছো কেন বলো ত? সঙ্‌ দেখ্‌ছ?'

একজন কে-যেন বল্‌লে, 'সঙ্‌ নয়, মাতাল।'

'তবে রে—' বলে দু'পা গিরীন এগোতেই সবাই যে-যার পালাতে লাগলো। দেখা গেল, তার মুখ-চোখের চেহারা দেখে বাড়ীওয়ালারো রাগ কতকটা প্রশমিত হয়েছে। হ্যাঁ, ভাড়াটা আগামী কাল অবশ্য সে পাবেই : গিরীনের চরিত্র-দোষ থাকুক, কিন্তু তার কথার ঠিক আছে! বাড়ীওয়ালা বিদায় নিল।

সবাই চলে যাবার পর বুড়ী বললে, 'দেখছিলুম তোমাদের কাণ্ডটা। রক্ত ত' সবারই গরম বাবা, ঠাণ্ডা রাখতে পারে ক'জন? তোমার বাছা অল্পবয়েস, ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে চললেই পারো।'

বুড়ীর কথাগুলি ভারি মিষ্টি : গিরীনের আর রাগ নেই। সে বললে, 'কোন্ ঘরে থাকা হয় বুড়ী-মা?'

'নীচের তলায় ওই পেছন দিকে দু'টো ঘর···ভাল বাড়ী ত আর খুঁজে বা'র করবার সময় ছিল না, এসে পড়তে পারলে হয়। হঠাৎ বিপদে পড়লে মানুষ—আর অল্পদিনের জন্যে—'

কথায়-কথায় জানা গেল, কি যেন একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে বুড়ীর জামাই এসে উঠেছে হাসপাতালে : মেয়ে সেই হাসপাতালে স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করতে গেছেন, একটা কেবিন্ ভাড়া করা হয়েছে। ছেলে-মেয়ে দু'টি আছে বুড়ির হেপাজতে। অবস্থা, যতদূর জানা গেল, নিতান্ত মন্দ নয়। অসুখ সারলেই আবার তা'রা দেশে চলে যাবে। অল্পদিনের জন্যই আসা। আলাপ-আলোচনাদির পর গিরীন বলে' বসলো, 'তোমার যদি দোকান-বাজার করবার দরকার থাকে, আমাকে

ব'লো—ভয় নেই বুড়ী-মা, হিসেব-টিসেব সব এসে আমি বুঝিয়ে দেবো।'

'না বাবা, আমার সঙ্গে একটা ঝি আছে।' এই ব'লে বুড়ী তখনকার মতো বিদায় নিল।

শেষ কথার আত্মীয়তাটুকু বুড়ী হয় ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারলো না। বুড়ীর দোষ নেই, যে-আত্মপরিচয় গিরীন একটু আগে প্রকাশ করেছে, সেটা অত্যন্ত শ্রীহীন বর্ব্বরতা; মানুষ যদি তা'কে বিশ্বাস না করে তবে সে তাদের অপরাধ নয়। এ বাড়ীটা প্রকাণ্ড, অনেকগুলো মহল, চার-পাঁচটা প্রবেশ-পথ, কে-কোথায় খণ্ড-খণ্ড পরিবার নিয়ে ছড়িয়ে থাকে গিরীন কোনোদিন হিসাব করেও দেখে নি, সে গ্রাহ্যই করে না। সে করে না, কিন্তু আর-সবাই যে তা'র সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত এও ত আর গোপন করা চলে না। তার যাতায়াতের পথে মুখোমুখি হ'লে সবাই সভয়ে সরে দাঁড়ায়, কলতলায় সে এসে দাঁড়ালে কি-মেয়ে কি-পুরুষ সন্ত্রাসে সেখান থেকে চলে যায়; তা'র যেদিকে ঘর সেদিকে মশা-মাছি পর্য্যন্ত এগোয় না। পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই মানুষ বাঁচে: গিরীনকে চিরদিন সবাই এড়িয়ে এসেছে। সে জানে না বটে কিন্তু তার সম্বন্ধে সকল সংবাদ এ-বাড়ীর সবাই রাখে।

নিজের ঘরে এসে গিরীন ঢুকলো। এখনি তা'কে বেরোতে হবে। কোথায়, তা সে নিজেও জানে না। তার না-আছে কার-কারবার, না-আছে চাকরি। তবু সে বেরোয়, প্রতিদিনই বেরোয়,

এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে না-বেরোলেই তার চলে না। রাত্রে সে যখন ফেরে এ-বাড়ীতে সবাই তখন নিদ্রা যায়। পরিবার-পরিজন তার কেউ নেই, ছিল কিম্বা আছে এ-প্রশ্ন কেউ তাকে কোনোদিন করেও নি। সম্ভবত নেই। অবস্থা তার মন্দ নয়, বরং এ-বাড়ীর অনেকের চেয়েই ভাল, কিন্তু সে-অবস্থার নদীতে নিত্য জোয়ার-ভাঁটা—তা'তে ঐক্য নেই, সঙ্গতি নেই।

বাইরে পায়ের শব্দে পায়চারি থামিয়ে গিরীন দাঁড়ালো—'কে ?—আরে, বুড়ি-মা, এসো এসো—'

বুড়ী একখানি রেকাবে করে' কতকগুলি আনারস কেটে এনেছে, তার পাশে দু'টি সন্দেশ: হাতে এক গেলাস জল। বললে, 'খেয়ে নাও ত দাদা ··আজ দ্বাদশী কিনা ··তুমি বাউনের ছেলে—'

গিরীন হেসে বুড়ী-মার হাত থেকে সেগুলি নিল। বললে, 'আজ কী সুপ্রভাত, তোমার সঙ্গে দেখা—এসব ত আর আমাকে কেউ দেয় না···বসো তুমি বুড়ি-মা, তোমার সামনেই ব'সে-ব'সে খাবো—' একখানি-একখানি আনারস মুখে দিয়ে চিবোতে-চিবোতে সে পুনরায় হেসে বললে, 'আমার মা'র কথা মনে পড়ছে, বুঝলে বুড়ি-মা, দ্বাদশীতে আমি মুখের কাছে না দাঁড়ালে তিনিও জল খেতেন না—মা বড় মিষ্টি, না বুড়ি-মা ?'

বুড়ী বললে, 'আহা, তা আর নয় ভাই, সব্বংসহা—তবে আর মা বলেছে কেন ? বলে—কুপুত্তুর যগুপি হয় কুমাতা কখনো নয়।'

তারপর একটু-একটু ক'রে বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ চলে। গিরীন-যে ভদ্রঘরের সন্তান, অবস্থা-যে একসময় তাদের বেশ ভালই ছিল, এ-কথা বৃদ্ধা স্পষ্ট করে' জানতে পারে। বছর দশ-বারোর ইতিহাস সে আর বুড়ী-মার কাছে প্রকাশ করলে না। বললে, 'লোককে বললে কি-আর এখন বিশ্বাস করবে, আমি লেখাপড়া জানি—একটা পাশও করেছিলুম বুড়ি-মা—কিন্তু সে-সব কথা আর মনে নেই···কোথা দিয়ে যেন কী হয়ে গেল এই ক'টা বছর।

এমন সময় একটি মেয়ে এসে বুড়ীর পাশে দাঁড়ালো। হাতে তার একটি ছোট পাথরের বাটি—'এই নাও দিদ্‌মা, মুখশুদ্ধি আর পয়সা—'

'এইটি বুঝি তোমার নাৎনী বুড়ী-মা? ভারি ফুট্‌ফুটে মেয়েটি ত?'—হাসতে-হাসতে গিরীন একটু এগিয়ে এলো, তারপর চোখ পাকিয়ে হাতের থাবা দুটো তুলে ভয় দেখিয়ে বললে, 'হালুম্‌!'

মেয়েটি ভয়ে আঁৎকে উঠে দিদিমাকে আঁক্‌ড়ে ধরলো, হাত থেকে তার একটা দু'আনি মেঝের উপর ছিট্‌কে পড়লো।

নিজের বন্য রসিকতায় গিরীন নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তার সঙ্গে একটু হেসে দু'আনিটি কুড়িয়ে নিয়ে বৃদ্ধা বললে, 'এই নাও ভাই, এই তোমার দক্ষিণে···অমনি ত খাওয়া'ন্ত নেই বাঁউনের ছেলেকে—'

গিরীন একটু প্রতিবাদ ক'রে বললে, 'সে কি বুড়ি-মা, পৈতে আছে বলেই বুঝি আমি বামুন—না, না—'

'সে কি হয় ভাই, এ-যে নিয়ম···আমরা অপরাধী হবো ?'

অগত্যা দু'আনা পয়সা ব্রাহ্মণের প্রণামী-বাবদ গিরীনকে গ্রহণ করতে হ'লো। বৃদ্ধার আর বসবার সময় ছিল না, রান্নাবান্না বাকি। উঠে যাবার সময় বললে, 'আচ্ছা দাদা, আলাপ-সালাপ হ'লো—আর এই ত নীচেই রইলুম···ও-ভাই কমু, পেন্নাম কর্ বাছা, বাঁউনের ছেলে, গলায় আঁচল দিয়ে পেন্নাম কর্—'

মেয়েটি এতক্ষণে একটু সাহস পেয়েছিল : অর্থাৎ, এই জংলী লোকটা যে সত্যই ব্যাঘ্র নয় এ-কথাটি সে অনুভব করেছে। দিদিমার কথায় গলায় আঁচল দিয়ে মেঝেয় নুইয়ে প'ড়ে সে গিরীনকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো। গিরীন বারণ করলো না, অস্বীকার করলো না, এমন কি দু'পা পিছিয়ে যাবার চেষ্টাও তার দেখা গেল না।

দরজার বাইরে যেতেই গিরীনের মাথায় আবার পাগ্‌লামি চেপে বসলো। হঠাৎ গিয়ে হেসে পুনরায় সে কমুর দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বলে' উঠলো—'হালুম্!'

কমু ফিরে দাঁড়ালো, একটুখানি পরিচ্ছন্ন ও স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললে, 'ইঃ, এবারে আর ভয় খাবো না, তুমি বাঘ না আরো কিছু!'

দিদিমার গলা ধরাধরি ক'রে কমু নীচে নেমে গেল।

কাঁচের আওয়াজ

বেশ লাগছে দিনটি : গিরীন বেশ খুসি আছে। খুসি সে রোজই থাকে, কিন্তু আজকের সঙ্গে মিল নেই প্রতিদিনের। তার জাতি ছিল না ; ভুলেই গিয়েছিল সে কোন্ জাতি : আজ একজন এসে স্বীকার করেছে সে ব্রাহ্মণ, তাকে দক্ষিণা দিযে আশীর্ব্বাদ নিয়ে যেতে হয়। আজ বারো বছরের মধ্যে কোথাও মনে পড়ে না যে, কোনো একদিন কোনো রকমে তার ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশ পেয়েছে। পৈতাটা ভাগ্যি সে রেখেছিল।

কিন্তু প্রণামটা ?—জীবনে কেউ তা'কে কোনোদিন প্রণাম করে নি। শরীরের নানা জায়গায় তা'র আছে ক্ষতের দাগ, একটা আঙুল তা'র কাটা, একটা পায়ে একটু খুঁড়িয়ে চলে—দেহের এই সমস্ত ক্ষত ও ক্ষতির ছোট-ছোট ইতিহাস তার অন্তরে জমা আছে, সে-ইতিহাস কেবল কলঙ্ক ও লজ্জার—তাদের ছাপিয়ে এলো আজ এই প্রণাম : একটি নিষ্পাপ, কলুষলেশহীন কুমারীর প্রণাম। তার গায়ে কাঁটা দিল। সে যে বড় অযোগ্য !

সারা দুপুরটা গাযে পথের হাওয়া লাগিয়ে বিকালে সে বাড়ী ঢুক্‌লো। ঢুকেই সিঁড়িতে উঠ্‌তে আবার কমুর সঙ্গে দেখা। ওদিকে ঝি কাজ করছে। বুড়ী-মা খাইয়ে দিচ্ছেন কমুর ছোট্ট ভাইটিকে। কমু তাকে দেখে বললে, 'একবার হালুম্ ব'লো ?'

'হালুম্।' ব'লে গিরীন তেড়ে গেল। কিন্তু কমু আর ভয় পায় না : হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো। বললে, 'তুমি ফুঁ দিয়ে তুলোর পাখী ওড়াতে পারো ?'

গিরীন বললে, 'হ্যাঁ, পারি।'

'কই ওড়াও দিকি?'—ব'লে ঘরে গিয়ে কোথা থেকে কমু একটু তুলো নিয়ে এলো। বললে, 'একটা আমি, একটা তুমি··· মাটিতে যার আগে পড়বে সেই হারবে কিন্তু।'

'বেশ, তাই সই।' ব'লে গিরীন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

দুই চিম্‌টি হাল্‌কা শিমুল তুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে দু'জনে তলার দিক থেকে প্রাণপণে ফুৎকার দিতে লাগলো: সে কী উৎসাহ। নাৎনীর এই বাচালতায় দিদিমা তিরস্কার করতে লাগলেন, কিন্তু তখন কে-কা'র কথা শোনে। ছেলেটা খাওয়া ফেলে ছুটে এলো। কমুর তুলো শূন্যেই ভাসছে, গিরীনের তুলোটুকু বোধহয় একটু ভারি, কেবলই নেমে পড়চে। অবশেষে মেঝের কাছাকাছি আসিতেই গিরীন দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁ দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই না: তুলো পড়লো মাটিতে, তারই হ'লো হার। সর্ব্বাঙ্গ তখন তার ঘর্ম্মাক্ত, মুখ-চোখ রাঙা। কমু বিজয়োল্লাসে হৈ চৈ ক'রে হেসে বললে, 'কেমন হয়েচে, বললুম পারবে না আমার সঙ্গে? হেরেছে ত? কানমলা খাও এবার?'

গিরীন নিজের হাতেই নিজের দু' কান মলে' বললে, 'আর কি?'

'নাকখৎ দাও মেঝের ওপর?'

কথাটা শুনেই দিদিমার চোখ পড়লো এদিকে: হাঁক পেড়ে

বললেন, 'বলি হ্যাঁলা কমু, তোর কাণ্ডটা কি? বাছাকে এমন ক'রে হয়রাণি করা ··ও কি তোর একবয়েসী—?'

'বাড়ী রেখে আমার সঙ্গে খেলতে আসে কেন দিদমা, আমি নাকি ডাকতে গেছলুম?'

রোয়াকের ধারে গিরীন বসে পড়লো: তখনো সে হাঁপাচ্ছে। কমু এসে বসলো তার কাছে: যেন কতদিনের বন্ধুত্ব, কতকালের পরিচয়। কমুর কানে দু'টি দুল, হাতে কয়েকগাছি নূতন ফ্যাশনের সোনার চুড়ি। কমু দেখতে সুন্দর, আর-একটু বড় হলে আরো সুন্দর হবে: জ্ঞান এবং অজ্ঞানের সন্ধিস্থানে সে পা দিয়েছে। জীবনে যার বারে বারে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে, কমুর কাছে বসতে তার বড় সঙ্কোচ হয়।

কত গল্পই চলতে লাগলো। কবে কোন্ গ্রামের ধারে একটি জন্তীগাছের তলায় একটা ছাতার পাখী মরে' পড়েছিল তারই রোমাঞ্চকর ইতিহাস: পাঠশালার পণ্ডিত কোন্ এক বর্ষাকালে কেমন পা পিছলে পড়ে' গিয়েছিলেন: আর সেই-যে ডালিম-বৌ একদিন ভূতের ভয় পেয়ে কাঠের সিন্দুকের মধ্যে ঢুকেছিল, সে-কথা কি কেউ ভুলে গেছে?

গিরীন বললে, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বাগানে একবার তাকে একটা মাকড়সা তাড়া করেছিল: সে তখন খুব ছোট। সেই সময়টায় সে একদা ধরেছিল একটা কোকিলের ছানা, কমুর মতো তার ঠোঁটের ভিতর ছিল লাল: মরে গেল সেই

পাখীটা একদিন : রাঙা পিঁপ্ড়ে তার চোখ খুব্লে খেতে লাগলো।

যাতায়াতের পথের পাশে তাদের গল্প চল্ছিল, দু' জনেই চলেছে ভেসে ভেসে। লোকনাথ তাদের দিকে একবার কটাক্ষে তাকিয়ে পার হয়ে গেল, পার হয়ে গেল ও-ঘরের ন'-বৌ। তাদের চোখে-মুখে আশঙ্কার ছায়া—এই কুপরিচিত দুঃশীল ও বিপজ্জনক লোকটা মেয়েটিকে না বিপদে ফেল্লে হয়। কমুর গায়ে অতগুলি সোনা-দানা : তা ছাড়া সম্ভ্রান্ত ঘরের কুমারী মেয়ে···ও-লোকটার ত আর ধর্ম্মজ্ঞান নেই—ভগবান জানেন, কী মৎলব আছে ওর মনে-মনে।

'তুমি সাবানের ফেনা দিয়ে রঙীন ফানুস ওড়াতে পারো?'

পারি না? তাসের ঘরও তৈরি করতে পারি। কতবার করেছি।' গিরীন বল্লে।

'আর কাপড়ের ইঁদুর?—দেখবে একটা মজা···চোর আসবে কেমন?—ব'লে কমু নিজের দুই হাতের আঙুল ক'টি পাকিয়ে এক অদ্ভুত উপায়ে ধরে বল্তে লাগলো, 'এই ছাখো, বর আর বউ ঘুমিয়ে রয়েচে ঘরে : দরজায় খিল বন্ধ; তিনটে চোর নীচের তলায় ফন্দি আঁটুচে, চুরি করবে : কুকুরটা ডাক্‌চে ঘেউ-ঘেউ ক'রে—দেখলে ত?'

গিরীন বললে, 'আমিও পারি, দেখবে? এই ছাখো : খরগোস ছুটুচে জঙ্গলে : ব্যাধ তাড়া করেছে; তীর এসে বিঁধলো খরগোসের বুকে; মরে গেল সে।'

কাঁচের আওয়াজ

কমু আর-একটু কাছে এগিয়ে এলো। বল্‌লে, 'আমাকে শিখিয়ে দেবে? তুমি ত অনেক জানো।'

হ্যাঁ, অনেক জানে সে; অনেক দেখেছে সে জীবনে। কিন্তু কিছু যে জানে না তাকে কিছু শেখানো কঠিন। দু'জনের মধ্যে যে তফাৎ অনেকখানি। একজন কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুট্‌ছে, আর-একজন ফল হয়ে ঝরে পড়েছে: পোকায় খেয়েছে তার শাঁস, তার প্রাণের ঐশ্বর্য্য: জীবনটা তার খরচ হয়ে গেছে। গিরীন চোখ তুলে তাকালে, তার দিকে। সুন্দর দুটি চোখ; সে-চোখে এখনো ছায়া পড়ে নি পৃথিবীর মালিন্যের: এখনো তা'তে রয়েছে আকাশের মায়া।

ধীরে-ধীরে সে উঠে দাঁড়ালো। বল্‌লে, 'শেখাবো আর-এক সময়, বুঝলে কমু? এখন যাই।'

ভারাক্রান্ত মন, অবসাদগ্রস্ত দেহ—গিরীন চলে গেল আপন ঘরের দিকে।

সন্ধ্যার পরে কমুর মা ফিরে এলেন: তাঁর চোখে-মুখে একটু আশ্বাসের চিহ্ন। কমুর বাবা হাসপাতালে একটু ভাল আছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হযে উঠ্‌তে এখনো ক'দিন সময় লাগবে। মা এসে সারাদিনের কথালাপ সুরু করলেন দিদিমার সঙ্গে। ছোট ভাইটি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কমু এক ফাঁকে বেরিয়ে এলো। ভাল লাগচে না তার ঘরের মধ্যে। কেমন ক'রে লাগবে? একদিকে তার জয়ের আনন্দ,

আত্মপ্রসাদ : অন্যদিকে কৃতিত্ব আহরণের প্রবল তৃষ্ণা ! গিরীনের কাছে তার না গেলেই চল্‌ছে না ! সমস্ত ম্যাজিকগুলো তার শিখে নেওয়া চাই-ই : দেশে গিয়ে মিণ্টু আর শৈলকে সে চম্‌কে দেবে : বল্‌বে না সে কেমন ক'রে শিখেছে : জানাবে না সে কাউকে তার এই যাদু শেখার গোপন ইতিহাস।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দোতলায়। চাটুয্যে মশাইয়ের ঘরের কাছ ঘেঁষে যাবার সময় বড়দিদি বললেন,'অ কমু, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ মা ? এত রাতে—'

'ম্যাজিক শিখ্‌তে যাচ্ছি পিসিমা।'

'ছি মা, যেতে নেই ওদিকে, ফিরে এসো ; ওদিকে বাঘ আছে, জানো ত ?'

স্নেহের সম্পর্ক সকলের সঙ্গে হয়ে গেছে। অনুকূল প্রকৃতি হ'লে সম্পর্ক তৈরি হতে একদিন সময়ও লাগে না। কিন্তু বারণ শুন্‌লো না কমু কারো : গেল সে গিরীনের ঘরের দিকে। সমস্ত বাড়ীটার সঙ্গে এদিকটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন : অটল নীরবতা বুক চেপে বসেছে। বারান্দায় আলো নেই, আলোর চিহ্নও নেই এদিকে। কমু গিয়ে ঘরের কাছে দাঁড়ালো। দরজার একটা কপাট বন্ধ ; কৌতুক ক'রে কমু দিল দরজায় একটা টোকা : ভিতর থেকে রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে জবাব এলো, 'কে অ ?'

আবার পড়লো এক টোকা : হাসি চাপতে গিয়ে কমুর পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বুঝি পাকিয়ে যায়। ভিতর থেকে গিরীন

ধমক দিল, 'ইয়ার্কি করিস নে আবদুল, ভেতরে আয়—' গলার আওয়াজটা তা'র একটু জড়ানো।

তবু এলো না দেখে গিরীনের একটু সন্দেহ হোলো : ঘরে আলো জ্বল্ছে : উঠে সে দরজার কাছে আসতেই কমু আর সাম্লাতে পারলো না : বাঁশীর মতো ধারালো তার তীব্র দীর্ঘ কণ্ঠে হেসে উঠলো। হেসে উঠেই ধরলো গিরীনের একটা হাত চেপে। বল্লে, 'কেমন জব্দ ? টের পেয়েছিলে একটুও। কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছি। আচ্ছা, আবদুল কে বলো না ?'

'আবদুল ? সে একটা লোক, দোকানে বসে বিড়ি পাকায়। তুমি এলে এত রাতে ম্যাজিক্ শিখতে ?'

'বেশ করেছি, খুব করেছি। ওমা, কতকগুলো লাঠি তোমার ঘরে ; লোকের মাথায় মারো বুঝি ?—গেলাসে ক'রে কী খাচ্ছিলে তুমি ? এ রাম্!'

গেলাসটা রাখলো গিরীন তক্তার উপর। বললে, 'আচ্ছা, আর খাবো না, তুমি এসেছ যখন—'

কমু বল্লে, 'কী ওতে ?'

'ওতে ?'—হেসে গিরীন একটা ঢোক গিললো, বললে, 'ওতে জল।'

'জল বুঝি রাঙা হয় ? কি মিথ্যুক।'

হাতটা তা'র ছেড়ে দিয়ে কমু ঘরের চারিদিকে তাকালো : জান্লাগুলো সব বন্ধ : অত্যন্ত অস্বাভাবিক কতকগুলো গৃহ-

সজ্জা, একটার পাশে আর একটা থাকার কোনো যুক্তি নেই : সামঞ্জস্য নেই। ভিতরটায় খানিকক্ষণ থাক্‌লে আতঙ্ক হয়। ঘরে আলো সামান্য, কিন্তু সেই আলোতেই কমুর গায়ের গহনাগুলি ঝলমল করছে। গিরীন তা'র প্রতি একবার একান্ত দৃষ্টিতে তাকালো। গহনাগুলি বাজারে বিক্রি করলে তার অন্ততঃ ছ'মাস বেশ চলে যেতে পারে : বাজারে তার অনেক দেনা : হ্যাঁ, একটি সামান্য কাজ, তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ একটি কাজ এখুনি ক'রে ফেল্‌তে পারলে বহু মহাজনের লাঞ্ছনার হাত থেকে সে মুক্তি পায়।

'আচ্ছা, কমু?'

কমু তার দিকে তাকিয়েই ছিল এতক্ষণ, সে বুঝতে পারে নি। বন্য জানোয়ারের হিংস্র দৃষ্টিকেই সে চেনে, সে বুঝতে পারে না ভয়চকিতা হরিণীর চোখের মায়া। কমু বললে, 'ও মা, তোমার চোখ পিট্‌ পিট্‌ করছে কেন?'

একটু থতিয়ে সে বললে, 'আচ্ছা কমু, তোমার পুরো নাম কি?'

'পুরো নাম?—কমলিকা মিত্র। গাঁয়ে আমাকে সবাই খুকি বলে' ডাকে। ইস্‌, কি বিচ্ছিরি গন্ধ তোমার ঘরে, ভারি নোংরা কিন্তু তুমি।'

'আমি নোংরা : বাঃ, বেশ ত : আর তুমি বুঝি খুব পরিষ্কার?'

'ওমা, পরিষ্কার না? দেখ দিকি?'—নিজের প্রতি গিরীনের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কমু বল্‌লে, 'একটুও ধূলো-কাদা নেই। তুমি

ত একটা ভূত!'—ধমক দিয়েই সে হাসতে লাগলো। খুসী হোলো সে গিরীনের উপর: গিরীন প্রতিবাদ করছে না। গিরীন তা'র করতলগত।

'আচ্ছা, কা'র গায়ের জোর বেশি, বল ত কমু?'

তা'র আজগুবি প্রশ্নে কমলিকা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। হাসতে-হাসতে সে লুটিয়ে পড়লো তক্তার একটা ধারে। তার হাসির শব্দে আছে একটি প্রচ্ছন্ন শক্তি: পাথরে চিড় খায়: মাটি ওঠে কেঁপে: রাত্রি হয় চঞ্চল: ঘর ওঠে দুলে। তার হাসির শব্দই আলাদা।

'আমাকে আজ ম্যাজিক্ না শেখালে ছাড়বো না কিন্তু।'

গিরীন তখন একটু-একটু টল্‌ছে। বল্‌লে, 'মুখের ম্যাজিক দেখবে কমু?'

'সে আবার কি?'

'দাঁড়াও দেখাচ্ছি।' গিরীন বললে, 'শোনো: এই দাঁত দেখ্‌ছ ত? কথা বেরোবে এর পাশ দিয়ে।'

কমু হেসে বললে, 'সে ত সবারই বেরোয়।'

'আমার বেরোবে নতুন কথা। ওয়ান্, টু, থ্রি: আমি কি বিশ্রী।'

'তারপর?'

'ফোর্: আমি একটা চোর!'

কমু হাততালি দিয়ে আবার হেসে উঠলো। বল্‌লে, 'আচ্ছা,

তুমি লাঠি খেল্‌তে জানো ? ওরে বাপরে, আমাদের গাঁয়ের ঝণ্টু-পালোয়ান কী লাঠি খেলে। একবার একটা বাঘ মেরেছিল সে।'

'আমিও জানি লাঠি খেল্‌তে। বাঘ মারতে আমিও—'

'ইস্‌, তার মতন আর খেলতে হয় না।'

কথাটা গিরীনের পৌরুষে ভয়ানক আঘাত করলো। বল্‌লে, 'দেখ্‌বে ?' বলেই সে একখানা লাঠি টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো : বল্‌লে, 'ওই কোণে দাঁড়িয়ে ছাখো। তোমার ঝণ্টু-পালোয়ানকে হারিয়ে দেবো, তবে আমার নাম গিরীন গোসাই।'—ঈর্ষায় ধক্‌ধক্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে তা'র চোখ। এই বালিকার কাছে তার আত্মসম্মান আজ বিপন্ন।

কোণে গিয়েই দাঁড়ালো কমলিকা। গিরীন লাঠিটা বাগিয়ে ঘোরাতে লাগলো। দু'বার না ঘোরাতেই হোলো এক কাণ্ড : তক্তার উপরে ছিল গেলাসটা, লাঠির ঘা লেগে মেঝের উপর সেটা ছিট্‌কে পড়ে' সশব্দে চুরমার হয়ে গেল। চমক ভাঙলো তার এতক্ষণে : লাঠি নামালো। কিন্তু গেলাস ভাঙার সেই শব্দটা ঠিক কমলিকার হাসির মতো : হাসির মতো সেটা চুরমার হোলো। ভাঙা কাঁচের গেলাসের টুক্‌রোগুলির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে সে কমলিকার হাসির অনুরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ আওয়াজ। প্রাণ দিয়ে শুন্‌লো সেই শব্দটি : হৃদয়ের পদ্মপুটে ঢেকে রাখলো শব্দের সেই অনির্ব্বচনীয় ব্যঞ্জনাটি।

গেলাসের ভিতরকার দুর্গন্ধময় তরল পদার্থটুকু মেঝের উপর

গড়াতে লাগলো। কমলিকা হাসবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুক্‌লো আর একজন। গিরীন উঠ্‌লো শিউরে। নেশা গেল তার ছুটে: বললে, 'বেরিয়ে যা আবদুল, এখন যা ভাই—যা এ-ঘর থেকে।'

আবদুল গেল না; কুৎসিত দৃষ্টিতে কমুর দিকে একবার তাকিয়ে হেসে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'কোত্থেকে আন্‌লি রে একে? বাঃ!'

গিরীন চীৎকার ক'রে উঠলো, 'অপমান করিস নে ভদ্দল্লোকের মেয়েকে: বেরিয়ে যা বল্‌ছি। যাবি নে—?' বলেই সে কুলুঙ্গী থেকে বা'র করলো একখানা ছোরা: স্তিমিত আলোয় তার ফলাটা ঝল্‌সে উঠ্‌লো। খুন করতে যাওয়াটা তার অভ্যাস।

'শালা, মনে রাখিস্, আমি ইব্রাহিমের ছেলে।'—বলেই আবদুল গেল পালিয়ে। প্রতিজ্ঞা ক'রে গেল, ওই ছোরা একদিন সে পিছন থেকে বসাবে গিরীনের পিঠে।

গোলমাল একটা হোলো: বাড়ীর অনেকেই এলো ছুটে। দিদিমা এলেন, এলো লোকনাথ, চাটুয্যেমশাই এসে কমুর হাতখানা ধরে টেনে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে গেলেন। হৈ-চৈ হ'তে লাগলো। একজন ছুট্‌লো থানায় খবর দিতে! হতভাগা এবারে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে: এবারে সবাই পেয়েছে সুবিধা: দাগী আসামী: তিলে-তিলে করে পাপ, সময় হ'লে ফলে।

অন্যায় আজ সে কিছুই করে নি; জানে, শাস্তি তার হবে না।

পুলিশের কাণ্ড-কারখানায় সে আর ভয় পায় না। গিরীন বসে রইলো চুপ করে': এত লোকের অভিযোগের বিরুদ্ধে একটিও সে প্রতিবাদ করলো না। সবাই একে-একে চলে' যাবার পর হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে সে কাঁচের টুক্‌রো গুলি একত্র করতে লাগলো। এক জায়গায় সেগুলি একত্র ক'রে একটি-একটি হাতে নিয়ে সে আবার মেঝের উপর বাজাবার চেষ্টা করলো: শব্দ হ'তে লাগলো ঠুন্‌-ঠুন্ ক'রে: কান পেতে রইলো সে কাঁচগুলির আওয়াজের প্রতি। কাঁচ ভাঙার মতো হাসি। কমলিকার হাসি।

অনেক রাতে পুলিশ এলো তাকে গ্রেপ্তার করতে।

*

* *

দু' বছর বাদে সে জেল থেকে ছাড়া পেলো।

মতি-গতি তার বদ্‌লায় নি। একজন মার্কমারা ভবঘুরে: বেকার: দাগী আসামী: নগরীর পথে-পথে তা'কে ঘুরতে দেখা যায়। অনেক বন্ধু তার চারদিকে· অনেক সঙ্গী। তবু মাঝে-মাঝে ফাঁক পেলেই সে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায়-রাস্তায় ট্রাম চলে: বাস চলে: তাদের ঘণ্টার আওয়াজ তার কানে আসে। দম্‌কল ছোটে, তার ঘণ্টার সঙ্গে গিরীনের মন উধাও হয়ে যায়। দোকানের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়: টাকা-পয়সার শব্দ

হয়। চাবি-সারানোওয়ালা বড় একটা আংটায় এক-গোছা চাবি বেঁধে ঝণাৎ-ঝণাৎ শব্দ ক'রে চলে যায়: গিরীন কিছুদূর যায় তা'র সঙ্গে-সঙ্গে। খঞ্জনী বাজিয়ে ভিখারী গান গাইলেই সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে শোনে। শোনে সে কান পেতে: আর ভাবতে চেষ্টা করে এই শব্দের মধ্যে তার অতীত জীবনের কোনো স্মৃতি জড়িত কিনা।

নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ায়: ষ্টীমারের বাঁশী বাজে। কুলুকুলু গঙ্গা বয়ে যায়, গিরীন চেয়ে থাকে সেই দিকে। চেয়ে থাকে উদাস হয়ে।

অবশেষে একদিন খুনের দায়ে সে আবার ধরা পড়লো। বিচারে হোলো তা'র যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। হাতে-পায়ে লোহার শিকল দিয়ে যখন তাকে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে, লোহার শিকলের ঝুম্‌ঝুম্ আওয়াজটি শুন্‌ছে সে কান পেতে, এও প্রায় সেই ভাঙা কাঁচের টুক্‌রোর মতো আওয়াজ। জীবনে একটি দিন মাত্র তার বসন্ত এসেছিল, একটিদিন মাত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল কাঁচের গেলাস: আলো এসে পড়েছিল তার অন্ধকূপে: দেখা পেয়েছিল সুন্দরের! হেসেছিল কমলিকা।

জেলএর পাখী এসে পৌছলো জেলএ: তখন খাবার ঘণ্টা বাজ্‌ছে।

'লীডার'

বারান্দার ধারে স্বামী-স্ত্রীতে বসিয়া হাসাহাসি করিতেছিল। কোলের কাছে একখানা বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র খোলা, তাহারই সম্পাদকীয় কলমে একটা লেখা পড়িতে পড়িতে বিমলা হাসিয়া উচ্ছ্বসিত হইতেছিল।

স্বামী তাহার চোখে হাত চাপা দিয়া কহিল, কিছুতেই পড়তে দেবো না।

পড়বোই আমি। স্ত্রী কহিল, চোখে হাত চাপা দেবে কি, আমার যে মুখস্থ হয়ে গেছে!

বেশ, তুমি পড় তবে, আমি চললাম। বলিয়া স্বামী উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই বিমলা তাহার কোঁচার খুঁট চাপিয়া ধরিল। বলিল, বসো, বসো বল্‌চি। আমিও পড়বো তোমাকেও লক্ষ্মী হয়ে শুনতে হবে।

হাতের শাসন নয়, চোখের ও হাসির শাসন—অগত্যা সতীশকে বসিয়া শুনিতে হইল।

বিমলা পড়িয়া গেল—'অল্প সময়ের মধ্যে যে কয়জন ব্যক্তি রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার নাম শুনে নাই বাংলা দেশে এমন লোক আজকাল অতি বিরল। সভায় সমিতিতে উৎসবে

আয়োজনে, রাজনৈতিক যে কোনো যুক্তিতর্ক সভায় সতীশচন্দ্রের প্রয়োজন সর্ব্ববাদীসম্মত। তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিলে সভায় হর্ষধ্বনি হয়, তাঁহার বক্তৃতা ছাপিলে সংবাদপত্রের কাট্‌তি বাড়ে। দেশের মঙ্গলার্থ তিনি চারবার কারাবরণ করিয়াছেন। আমরা অকপটে বলিতে পারি, তিনি আধুনিক বাংলার যে-কোনো যুবকের আদর্শস্থল। বর্ত্তমানে তাঁহার শরীর অসুস্থ, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি শ্রীভগবান তাঁহাকে শীঘ্র নিরাময় করুন।'

বিমলা হাসিয়া থামিল, বলিল, খবর একটা দেবো নাকি যে শ্রীভগবান এঁদের প্রার্থনা শুনেচেন ?

সতীশ কহিল, বেশ ত, দাও না ?

না দিলেও খবর পেয়ে যাবে। আজকাল দুটো জিনিস তোমাদের বোধ হয় খুব চলে, কাগজের দল আর দলের কাগজ। বলো ত সত্যি করে, এই কাগজওলাদের সঙ্গে তোমার চুক্তি কি ?

সতীশ হাসিয়া কহিল, আমার প্রশংসা দেখে বোধ হয় তোমার হিংসে হচ্ছে।

বিমলা বলিল, হিংসে হয় না, হাসি পায়। এগুলো প্রশংসা নয়, বিজ্ঞাপন। শুধু পাঠকদের জানানো তুমি এদের দলে আছো। আচ্ছা, আজকাল বোধ হয় সব চেয়ে বড় দেশের কাজ—দল গড়া, কাজ করা নয়, কেমন ? বলো না সত্যি করে, আমি মেয়েমানুষ, অত বুঝতে পারি নে।

সতীশ কহিল, তোমার কি ইচ্ছে তোমার সঙ্গে আমি পলিটিক্যাল্ তর্ক করব ?

না, বিমলা বলিল, আমাকে উপেক্ষা করে যাও, মেয়ে মানুষের সঙ্গে তর্ক করলে তোমাদের সম্মান হানি হতে পারে, সাবধান।

দুষ্টু। বলিয়া সতীশ হাসিয়া তাহার একটা হাত মুচড়াইয়া দিল।

কাগজখানা সরাইয়া আদর জানাইয়া সতীশের কোলের মধ্যে মাথা দিয়া বিমলা কহিল, আচ্ছা তোমাদের দেশে এমন নেতা নেই যিনি সব চেয়ে দরিদ্র ?

এ তোমার হেঁয়ালি বিমলা।

তা হবে। বলিয়া বিমলা হাসিতে লাগিল।

অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল সন্ধ্যার দিকে। বারান্দার বাহিরে আকাশে সপ্তমীর চন্দ্র ইহাদের আলাপ ও আলোচনার ফাঁকে একটু একটু করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। হিন্দুস্থানী চাকরটা আসিয়া তাহাদের চা ও জলখাবার দিয়া গেল।

দক্ষিণ দিক হইতে মৃদু মৃদু বাতাস আসিতেছিল। সেইদিকে তাকাইয়া দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বিমলা কহিল, আচ্ছা নেতা মশাই, এমন সুন্দর সন্ধ্যায় কী ভাল লাগে বলুন ত ?

তুমিই বলো না ? সতীশ কহিল।

সত্যি বল্‌ব ? এখন আমার ভাল লাগে বেকার সমস্যার কথা, মন্দির আর মসজিদের গণ্ডগোল, যুক্ত নির্ব্বাচনের—

সতীশ ততক্ষণে তাহার অধরের উপর একটি গভীর চুম্বন বসাইয়াছে। বিমলা হাসিয়া তাহার চুম্বনটি পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া বলিল, আচ্ছা তুমি কী বলো ত? দেশসুদ্ধ সবাই যখন তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তখন তুমি স্ত্রীর সঙ্গে লীলা-বিলাসে ব্যস্ত! বাস্তবিক, জন্মভূমিকে স্বাধীন করবার ভার যারা নেবে তারা যেন বিয়ে না করে! পুরুষ মানুষ একেবারে অকেজো হয় কখন্ জানো, যখন তারা ভালোবাসে! প্রেমে পড়লে আমরা হই চতুর, তোমরা হও ফতুর।

সতীশ কহিল, থেমেছ? এবাব হাততালি দিই?

বিমলা হাসিয়া স্বামীকে একটি চিম্‌টি কাটিল।

চা ও জলখাবার খাইয়া তাহারা মোটরে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, আজ তোমার একটা মিটিং ছিল না?

হ্যাঁ, লিখে পাঠিয়েছি—শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন—

বাঁচলাম। বলিয়া বিমলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

একটা বাগানে ঢুকিয়া তাহারা একান্তে গিয়া বসিল। এবার জেল হইতে বাহির হইবার পর আদর-অভ্যর্থনার জ্বালায় স্বামীকে দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া নিভৃতে পাওয়া বিমলার হইয়াই উঠে না। তাহার কাঁধের উপর মাথা হেলাইয়া হাত দিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া সতীশ বসিয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল, তুমি একটা সত্যি কথা বল্‌বে?

কি বলো? •

বিমলা কহিল, এখানে কেউ নেই, চুপি চুপি বলো ত, তোমার ওপর গোয়েন্দাগুলোর আজকাল এত নজর কেন ?

সতীশ কহিল, ওটা যে ওদের চাক্‌রি !

তা বুঝলাম না হয় বেচারিদের অবস্থা, কিন্তু তোমার ওপর চোখ কি জন্যে ? সত্যি বলো ত তুমি বিপ্লবী-দলে ভিড়েছ কি না ?

হাসিতে হাসিতে সতীশ কহিল, তোমার ভয় বুঝি আবার আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে কিনা ? জেলকে অত ভয় কেন ?

বিমলাও হাসিল, বলিল, বটে ? জেলকে ত ভয় নয়, জেলে তোমার অবস্থাটার জন্যেই ভাবনা। তোমার চিঠিগুলো পড়ে' লজ্জায় আমি মাথা তুল্‌তে পারি নে, চিঠিতে অত ভালবাসা দেখে সবাই কি মনে করে বলো দেখি ? সব চিঠিই গভর্ণমেণ্ট থেকে পরীক্ষা হয়ে আসে ত ?

আসে বৈ কি। সতীশ বলিল।

আর একবার লজ্জায় বিমলা ভিতরে ভিতরে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বলিল, ছি ছি, তোমার চিঠির জন্যেই তোমাকে জেলে পাঠাতে আমার ভয় করে। তুমি যখন সভায় দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বক্তৃতা দাও তখন নিশ্চয়ই জেলার আর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মুখ টিপে টিপে হাসে। যারা দেশনেতা তাদের চরিত্রের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করা গভর্ণমেণ্টের খুব একটা বড় কাজ, তা জানো ? এর একটা সুবিধে তারা পায়।

সতীশ কহিল, কি করব, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি নে !

সেই ত হয়েছে বিপদ, একদিকে দেশ আর একদিকে আমি। দু' নৌকোয় পা দেওয়া তোমাদের অভ্যেস। অথচ এমন জায়গায় এসেছ, তুমি সবাইকে ছাড়লেও সবাই তোমাকে ছাড়বে না। সব চেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে খ্যাতির বিপদ!

এদিকে কেহ ছিল না, সতীশ এক হাতে বিমলার গলাটা জড়াইয়া লইয়া কহিল, অত করে' চিঠি লিখতাম অথচ জবাব আসতো না তোমার কাছে থেকে! কী করে' আমার দিন কাটত বলো ত? আমার যত আগ্রহ তোমার তত ঔদাসীন্য!

কী লিখ্‌ব? বিমলা কহিল, যে-চিঠি সবাই পড়বে সে-চিঠিতে ভালোবাসা লিখি কেমন করে?

আমি ত লিখতাম!

অন্যায় করতে, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আর লিখো না। ভালোবাসার চিঠি যদি বাইরের লোকে আগে পড়ে তবে তার জাত যায়।

সতীশ হাসিয়া তাহাকে একটি চুম্বন করিল। তারপর কহিল, সত্যি, সত্যি বিমলা, যেদিন তোমার চিঠি আসতো না, সেদিন আমার মনে হতো সব বুঝি মিথ্যে হয়ে গেল, কোনো কাজই যেন সেদিন আমার হলো না, নিরানন্দের মাঝখানে বসে কেবলই ভাবতাম আমি সঙ্গীহীন, আত্মীয়হীন। জেলের মধ্যে কত গল্প গান হাসি আড্ডা, কিন্তু সব তুচ্ছ, অর্থহীন, তাদের কোনো

জৌলুস নেই, ফাঁকা। সে সময় পলিটিক্‌স্?—বলিয়া সে ঠোঁট উল্‌টাইয়া নিজেকে একবার শ্লেষ করিয়া লইল, পুনরায় কহিল, আমার সমস্ত পলিটিক্‌সের নীচে আছে তোমার মুখখানি, তুমি আমার প্রেরণা আর উৎসাহ, তুমি আমার ধৈর্য্য আর শক্তি, তুমি আছো বলেই আমি জেলে যাবার সাহস পাই বিমলা।

বিমলা হাসিয়া কহিল,তুমি যেমন করে কথা বল্‌চ এমনি করেই চিঠি লিখতে, এর উত্তরে আমার লেখবার কিছু থাকতো না।

সতীশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিল। এবার বলিল, চাঁদের আলো পড়ে তোমাকে কি সুন্দরই দেখতে হয়েছে! বিমলা, সত্যি এত রূপ তোমার?

কি রকম দেখতে হয়েছে গো? একটু কবিত্ব করে বলো বাপু, শুনি।

কবিত্ব করে' বললে খুসী হও?

বিমলা কহিল, জগৎসুদ্ধ সবাই খুসী হয়। মেয়েমানুষের ওপর কবিত্ব করেই ত দুনিয়াটা হাবুডুবু খাচ্ছে।

মাথার খোঁপাটা তাহার ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, রেশমের মতো কতকগুলি নরম চুল হাতের মুঠায় লইয়া সতীশ নাড়াচাড়া করিতে-ছিল। বলিল, তোমার কাছে বসলে আমি একটা দুরন্ত উল্লাসে দিশে হারা হই; তুমি আমার—একথাটা ভাবলেই গায়ের রক্ত-গুলো আমার ঝম্ ঝম্ করে' নাচতে থাকে। পৃথিবীতে সব চেয়ে সুখী কে জানো বিমলা, তুমি যার স্ত্রী!

বিমলা হাসিতে হাসিতে কহিল, খবরের কাগজওলাদের দুর্ভাগ্য যে তোমার এ চেহারাটা তারা দেখতে পায় না।

ইচ্ছে করে তাদের একবার দেখাই বিমলা। দেশসুদ্ধ লোক ভাল করে জানুক আমি কী। মূঢ়-জনসাধারণের চোখ খুলে যাক্। দেশের জন্যে গলাবাজি করে' সভা-সমিতিতে কাঁদি বটে কিন্তু এ কথা ত ঠিক, আমার চেয়ে আনন্দময় সংসারে আর কেউ নেই!

বিমলা এবার আদর জানাইয়া কহিল, আর তুমি জেলে যাবে না বলো?

না, যাবো না। এবার যাবার কথা ভাবতেই পারি নে। দু'বছর মাত্র বিয়ে হয়েছে এর মধ্যে তিনবার জেল খাটলাম, এবার কিছুদিন বিশ্রাম নেবো বিমলা।

চারিদিক ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হইয়া আসিল, একে একে সকলে বাগান হইতে বাহির হইয়া গেল। উপরে খণ্ড মেঘের ভিতর দিয়া শুক্ল সপ্তমীর চন্দ্র উঠিয়াছিল। বিমলার কোলে মাথা রাখিয়া সতীশ ঘাসের জমীর উপর শুইয়া পড়িল।

ওকি, যাবার সময় শোবার পালা? রাত হয়েছে, চলো। খাওয়া দাওয়া হয় নি, ঘুম আসবে যে!

চোখ বুজিয়া সতীশ কহিল, একটা সত্যি কথা বলব বিমলা?

বিমলা হাসিয়া বলিল, এতক্ষণ বুঝি সব মিথ্যে কথা বলছিলে? দুষ্টু!

সতীশ কহিল, সত্যি বিমলা, এসব কিছু আমার ভাল লাগে

না, এই দেশপ্রীতির উত্তেজনা, রাজনীতি, সভাসমিতি, জেল—এই যা দেখচ সব। কিছু পেলাম প্রশংসা, কিছু নিন্দা, খানিকটা খ্যাতি, বাকিটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—কিন্তু কী হলো? চুপি চুপি বলি বিমলা, আমার ভাল লাগে নিভৃত নিশ্চিন্ত জীবন, অখ্যাত নগণ্য জীবন—কেউ চিনবে না, জানবে না, তুমি আর আমি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই! যাবে বিমলা, চলো আমরা চলে যাই সব ছেড়ে দিয়ে!

চন্দ্রালোকে মাঠের মাঝখানে প্রিয়তমাকে অতি নিকটে পাইয়া রাষ্ট্র-আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা এমনি করিয়া আরও অনেক বকিয়া গেল। কতকটা তাহার অর্থপূর্ণ, কতকটা নিতান্তই নিরর্থক; শেষকালে এক সময় তাহারা উঠিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গল্প করিয়া, হাসিয়া, মান-অভিমান করিয়া, ভোরের দিকে তাহাদের তন্দ্রা আসিতেছিল, এমন সময় বাহিরে জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দে তাহাদের ঘুম ছুটিয়া গেল। সতীশের ঘন আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বিমলা কহিল, কে ডাকৃচে না?

চোখ চাহিয়া সতীশ কহিল, ভোর হয়েচে? এত সকালে আবার কে ডাকে ছাই? এই আরম্ভ হ'ল!

দরজায় কে ধাক্কা দিতেছিল, বাহির হইতে কে যেন চীৎকার করিতেছে। সতীশ উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইল। তখন একটু একটু সকালের আলো ফুটিতেছে।

চাকর এবং দারোয়ান বোধ করি বাহিরের দিকে কোথায় ঘুমায়। একজন ঘুম-চোখে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, দাদাবাবু, পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করেছে !

পুলিশে ? কেন ? বলিয়া সতীশ অগ্রসর হইতেই বিমলা পিছন দিক হইতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল, কোথা যাও ?

সতীশ হাসিল, বলিল, ভয় কি বিমলা ? গ্রেপ্তার যদি করে, করবেই, পালাবার পথ ত নেই ! ছাড়ো, লক্ষ্মিটি !

তাহার হাত ছাড়াইয়া সতীশ বাহিরে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহাকে সুমুখে পাইয়াই সসম্ভ্রমে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু ও একজন সার্জ্জেণ্ট নমস্কার করিল। দরজার বাহিরে জন পঁচিশেক লাল-পাগড়ী হিন্দুস্থানী কন্‌স্‌টেব্‌ল সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম সতীশবাবু, ক্ষমা করবেন। আমরা কি করব বলুন, পেটের দায়ে পরের চাকরি—

সতীশ কহিল, কি বলুন না ? গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নাকি ?

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন, আজ্ঞে না, এ সামান্যই ! সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট আছে, আপনার ঘরগুলো একবারটি খানাতল্লাসী করে যাবো।

বছর দুই আগে এই লোকটাই একবার সদলবলে আসিয়া তাহার বাড়ী সার্চ্চ করিয়া গিয়াছিল, অবশ্য কিছুই পায় নাই। সতীশ কহিল, এবারের খানাতল্লাসীটা কি জন্য ?

দারোগা একটু হাসিল, বলিল, সরকারের খামখেয়াল সতীশ-বাবু, আপনার এখানে বিপ্লবাত্মক যদি কিছু কাগজপত্র—

আড়ালে দাঁড়াইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে বিমলা সমস্তই শুনিতেছিল। সতীশ হাসিয়া কহিল, আসুন। হ্যাঁ, দেখবেন, আপনারা সঙ্গে করে' কিছু আনেন নি ত?

উচ্চকণ্ঠে দারোগা হাসিয়া উঠিল। বলিল, বেশ ত' আমাদেরই আগে সার্চ্চ করে' নিন্ না সতীশবাবু?

কয়েকজন কন্‌স্টেব্‌ল্ সার্জ্জেণ্ট ও জমাদারকে সঙ্গে লইয়া ইন্‌স্‌পেক্টর অন্দরে প্রবেশ করিল। বড় বাড়ী, সকল দিকে নজর রাখিয়া কোনো কোনো ঘর বাদ দিয়া খানাতল্লাসী চলিল। লোকটা পাকা লোক সন্দেহ নাই। হাসিয়া হাসিয়া মিষ্ট কথা ও রসিকতা করিয়া আপনার কাজ গুছাইতে লাগিল। ঘণ্টা তিনেক ধরিয়া বেচারিদের পরিশ্রমের আর অন্ত রহিল না।

বেলা বাড়িল, আশে পাশে কৌতূহলী ও ভীত জনতা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, সকলের মুখে চোখে প্রবল উৎকণ্ঠা। বিমলা বারান্দায় দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে নিশ্চয় জানে বিপ্লবাত্মক একটু কিছু বাহির হইয়া পড়িলে স্বামীকে তাহারা গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবেই। কোনো আপত্তি চলিবে না, সার্জ্জেণ্ট পকেটের ভিতর হাত ঢুকাইয়া রিভল্‌ভার ছুঁইয়া আছে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোথাও কিছু না পাইয়া সকলে আসিয়া লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিল। ভিতরে দাঁড়াইয়া চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে

তাকাইয়া দারোগা কহিল, এ ঘরটা ত আপনার আগেই দেখে গেছি···আচ্ছা, ওখানে পুরানো এক পাটি জুতো পড়ে রয়েছে কেন? ওর মধ্যে ত কিছু···হ্যাঁ ভারি কষ্ট দিলাম আপনাকে সতীশবাবু।

সতীশ বিরক্ত হইয়া কহিল, তা একটু দিলেন বৈ কি, তবে কি জানেন, আজকালকার বিপ্লবীরা অত বোকা নয়···যদি কিছু থাকে ত ঘরে থাকে না, বুঝলেন মিষ্টার রায়?

মিঃ রায় কহিলেন, তা সত্যি, কিন্তু কি করব বলুন, আমাদের ওপর হুকুম। আচ্ছা, তাকের ওপর ওটা কি? স্যাচেল্ বুঝি? হ্যাঁ, স্যাচেল্গুলো আজকাল খুব সস্তা—মিউ মার্কেটে ওগুলো··· সন্দিগ্ধ আমাদের মন। আচ্ছা, তা ওটা লুকোনো রয়েছে কেন বলুন ত?

কিছুই নেই ওর মধ্যে মিষ্টার রায়, কেন মিথ্যে কষ্ট করে'—

বারান্দা হইতে রুদ্ধশ্বাসে বিমলা মুখ বাড়াইল।

তা বটে, মিথ্যে কষ্ট করা—যাই একবার দেখেই যাই। বিরক্ত করলাম আপনাকে—বলিয়া মিঃ রায় গিয়া তাকের উপর হইতে ধূলিমলিন ছোট একটা স্যাচেল্ বাহির করিলেন। ব্যাগটা খুলিতেই প্রথমে যাহা তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতে তিনি— সতীশের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া একটু ক্রূর হাসি হাসিলেন, এবং কিছুই না বলিয়া ভিতর হইতে কয়েকখানি পত্র বাহির করিয়া গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে সুরু করিলেন।

পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ হাসিতে ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সতীশ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি যখন তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, সে-মুখ দেখিয়া কঠিন-কঠোর সার্জ্জেণ্টটি পর্য্যন্ত বিস্মিত হইল। বিস্মিত হইল তাহার কারণ, মিঃ রায়ের মুখে চোখে এই বোধ করি প্রথম সে ক্রূর-কুটিলতা দেখিতে পাইল না। বরং দেখিল একটি অপরিচিত স্নিগ্ধতা, একটি কোমল কারুণ্য এবং রসোজ্জ্বল মুখে চোখে একটি সৌন্দর্য্যবোধের দীপ্তি!

ভিতরের অটল এবং অবিচলিত নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিমলা আর থাকিতে পারিল না, পিছন দিকের জানালাটা দিয়া সে ভিতরে মুখ বাড়াইল। সতীশ তখন পাথরের মতো দাঁড়াইয়া আছে।

মিষ্টার রায় কহিলেন, চমৎকার সতীশবাবু, সুন্দর! এমন সুন্দর চিঠি আমি জীবনে পড়ি নি, আপনি সত্যিই সৌভাগ্যবান্। বাস্তবিক, আজ বুঝলাম আপনার দেশপ্রীতির প্রেরণা কোথায়! কিন্তু আপনি ত বিবাহ করেচেন, ইনি ত স্ত্রী নন, কে ইনি, এই স্বর্ণরেখা দেবী? যাক্ গে, এ আমার বেআইনী কৌতূহল! আচ্ছা, আজকের মতো চললাম, প্রার্থনা করি আর যেন আপনার সঙ্গে দেখা না হয়, হেঁ হেঁ—নমস্কার করিয়া চিঠিগুলি মেঝের উপর ফেলিয়া সদলবলে তিনি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন।

ঘরের ভিতরে ও বাহিরে তখন দুই জোড়া চক্ষু পরস্পরের প্রতি

অপলক নিস্পন্দ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টি ভাষাহীন, রসহীন, রূপহীন। দুইটিই যেন মৃত দেহ!

পরদিন প্রাতে বড় বড় হরপে সংবাদপত্রে ছাপা হইল—'বিপ্লবাত্মক দলিল-পত্রের সন্ধানে সতীশচন্দ্রের গৃহে গতকল্য প্রাতে দীর্ঘ চারঘণ্টাব্যাপী খানাতল্লাস হইয়াছে কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই না পাইয়া পুলিশের দল ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সতীশচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বিচিত্রা

ছুটির দিন। দুপুর বেলাকার খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর সুমিত্রার পাশে বিছানায় শুইয়া যতীন হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিতেছিল। অল্প অল্প শীতের দিনে বাহিরের রৌদ্রে তাহাদের দুইটি ছেলে-মেয়ে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। দুইটিই ছোট ছোট।

তাহারা একটি সাধারণ প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবার। অনেক দিন হইতে বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া তাহারা যুক্তপ্রদেশের এই ক্ষুদ্র সহরটিতে বাস করিয়া আসিতেছে। যতীন রেলে আর-এম-এস বিভাগে চাকরী করে। মোটা মাহিনার চাকরী। লাইনে একবার বাহির হইলে সে দুই-তিন দিন আর বাসায় ফিরে না। এবং বাসায় যখন ফিরিয়া আসে তখন দুই-তিন দিন আর বাহির হয় না।

কথা হইতেছিল এবার বড়দিনের সময় দেশে যাওয়া চলিতে পারে কি না। বলিতে বলিতে এক সময় উৎকর্ণ হইয়া সুমিত্রা কহিল, কে ডাকল না ?

যতীন কহিল, আজ কেউ ডাকলে খুনোখুনি করব।

হ্যাঁগো, কড়া নাড়ল যে। বোধ হয় তোমার চাপরাশি।

চাপরাশি গেছে গ্রামে রামলীলা শুনতে। সে নয়।

বাহিরে আবার কড়া নাড়ার শব্দ হইল। তাই ত. কোনো টেলিগ্রাম এল নাকি ?—বলিয়া যতীন উঠিয়া বাহিরে আসিল। অসম্ভব নয়. রেলের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে মাঝে মাঝে তাহার নিকট জরুরী টেলিগ্রাম আসে। গলার সাড়া দিয়া কহিল, কে ?

উত্তরের বদলে শুধু আর একবার মাত্র কড়ার শব্দ হইল।

তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিযাই যতীন অবাক্ হইয়া গেল। স্যুটকেশ হাতে করিয়া একটি তরুণী এতক্ষণ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া দরজা খোলার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে দেখিযা কহিল. এটা যতীনবাবুর বাসা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কাকে চান ?

আপনিই যতীনবাবু ? ও। বলিয়া মেয়েটি হাত তুলিয়া তাহাকে নমস্কার করিযা পুনরায় কহিল, সুমিত্রা আছে। একবার ডেকে দেবেন ?

আপনি ভেতরে আসুন না ? এত রোদে বাইরে—

হোক গে, ও আমার গায়ে লাগে না। আপনি আগে তাকে ডেকে দিন্ দয়া করে।

যতীন ভিতরে গেল এবং তখনই সুমিত্রা দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিল। দুইজনে চোখোচোখি হইতেই দুইজনেই আনন্দে হাসিয়া উঠিল। সুমিত্রা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তরুণীটির একটি হাত ধরিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, কোত্থেকে রে ? একা ?

মেয়েটি কহিল, প্রথমত একা, দ্বিতীয়ত অতিথি।

সুমিত্রা তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া আসিল। ছেলে-মেয়ে দুইটি কোথা হইতে আসিয়া নবাগতাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সুমিত্রা তাহার স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিল, অবাক্ হয়ে গেছ, কেমন? তুমি একে কখনো দেখ নি, এর নাম যমুনা। আমরা একই বোর্ডিংয়ে থাকতাম। তুই একা এলি যমুনা, ভয় করল না?

যমুনা একবার যতীনের দিকে চাহিয়া সুমিত্রার প্রতি মুখ ফিরাইল। দেখিতে দেখিতে তাহার রৌদ্রশ্রান্ত সুন্দর মুখখানি সুস্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিল, ভয় আবার কি রে?

যতীন কহিল, কোথা থেকে এখন আস্‌চেন?

যমুনা বলিল, প্রথমে আমরা একদল মেয়ে বেরোই কল্‌কাতা থেকে। আগে যাই মধুপুরে, সেখান থেকে আগ্রা, আজ সকালে ওরা আগ্রা থেকে দিল্লী গেল, আমি গাড়ী চেঞ্জ করে এখানে এলাম। আবার সবাই মীট্ করব মধুপুরে।

যতীন হাসিয়া এবার স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলিল, এতটা রাস্তা ঘুরতে ঘুরতে এলেন, কেউ সন্দেহ করল না?

যমুনা তাহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, কি সন্দেহ বলুন? পালিয়ে যাচ্ছি কি না?

ধরুন অনেকটা তাই।

না, সে সুবিধে কাউকে দিই নি।

সুমিত্রা হাসিয়া একটা হাত দিয়া তাহাকে বেড়িয়া জড়াইয়া

ধরিল। যতীন আর একবার মাত্র এই তরুণীটির দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া গেল। ইহার বলিষ্ঠ উজ্জ্বল দেহ, অনলঙ্কার প্রসাধন, সরল চাহনি, অসঙ্কোচ আলাপ, সমস্তটা মিলিয়া তাহার অপূর্ব্ব বিস্ময় উৎপাদন করিতেছিল।

অনেকদিন পরে দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ। বন্ধুত্ব তাহাদের বহুদিনের। কলিকাতার বোর্ডিংয়ের পুরাতন মেয়েরা একদিন এই মাণিক-জোড়কে লইয়া কত গল্পই যে রচনা ও রটনা করিয়াছিল তাহা সুমিত্রা আজিও স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারে। তারপর কি একটা ছুটির সময় সুমিত্রা একদিন দেশে চলিয়া গেল এবং ছুটি ফুরাইলে আবার যখন সে বোর্ডিংয়ে ফিরিয়া আসিল, তখন সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, তাহার সিঁথিতে সিঁদুর উঠিয়াছে। যমুনা সেদিন আড়ালে গিয়া চোখের জল ফেলিযাছিল, এখনও মনে পড়ে।

তারপর একদিন বোর্ডিংহইতে সুমিত্রা বিদায় লইয়া শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল, ধীরে ধীরে চিঠি-পত্র লেখা কমিয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে সুমিত্রা দুইটি সন্তানের জননী হইয়া উঠিল। কিন্তু এই একটিমাত্র উদাহরণই নয়, গাছ হইতে পাকা ফল যেমন একটি একটি করিয়া খসিয়া পড়ে, তাহাদের বোর্ডিং হইতেও তেমনি যথাসময়ে এক একটি করিয়া ছাত্রী অদৃশ্য হইতে লাগিল। কোথায় গেল, কেন গেল, সকল সময়ে তাহার ঠিকানাও নাই,

কিন্তু যাইতে তাহাদের হইলই ; যমুনা নিঃশব্দে সকলের পথের দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছে।

এর চেয়ে বড় দুঃখ আর নেই ভাই—বলিয়া সুমিত্রা একটি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল, পুরুষ মানুষ হলেও বা কথা ছিল কিন্তু এ যে কে কোথায় গেল, কার ঘরে গিয়ে বন্ধ হ'ল, কে বেঁচে রইল আর কেউ-বা রইল না তার কোনো খোঁজই নেই।

ছোট ছেলেটিকে কোলে লইয়া যমুনা বসিয়াছিল, অতীত দিনের অনেক কথাই তাহাদের চলিতে লাগিল। জলযোগের আয়োজন করিতে যতীন বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। সুমিত্রা কহিল, এখন কোথায় আছিস্, কল্‌কাতায় ?

হ্যাঁ, মাসিমার ওখানে।

সুমিত্রা কহিল, সংসার ত কল্লি নে, মাসিমা কিছু বলেন না ?

যমুনা বলিল, বলেন কিন্তু শোনে কে ?

অবাধ্য হয়ে চিরকাল বেড়াবি ?

কি করি বলে দে না ?—বলিয়া যমুনা হাসিল।

সুপরামর্শটা সুমিত্রার মুখাগ্রে আসিয়াছিল : কিন্তু কেন জানি না এই স্বল্পভাষিণী বান্ধবীটির মুখের উপর সে কথাটি বলিতে তাহার বাধিয়া গেল। এ কথা সে আজিও ভুলে নাই, যমুনা চিরদিন সবিনয়ে লোকের উপদেশ ও পরামর্শ মাথা পাতিয়া লইয়াছে কিন্তু জীবনে কোনোদিন সে নিজের পথ ছাড়া অন্য পথে চলে নাই। তাহার সুন্দর হাসিটির পাশে একটি সুকঠিন দৃঢ়তার

ঘা খাইয়া সকলে ফিরিয়া আসিয়াছে। অবাধ্য এবং অদম্য বলিয়া বন্ধুসমাজে তাহার বিশেষ খ্যাতি। চুপ করিয়া সুমিত্রা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রূপের কথা থাক্ কিন্তু নিবিষ্ট নয়নে লক্ষ্য করিবার মতো একটা বিশেষ কিছু যমুনার মুখখানিতে সেদিনের ন্যায় আজিও লাগিয়াছিল। চোখের দৃষ্টিতে সাধারণ শিক্ষিতা নারীর চপলতার যেমনি অভাব, বুদ্ধির দীপ্তিতে তেমনি তাহা প্রখর। ভাল করিয়া কথা কহিতে কহিতে, মনে হয়, কোথা হইতে তাহার চোখে আলো আসিয়া পড়ে। মনে আছে, সুমিত্রা তাহাকে একটু সমীহ করিয়াও চলিত।

যমুনা হাসিয়া বলিল, তারপর ? কেমন আছিস ?

সুমিত্রা কহিল, দেখচই ত, স্বামী, সন্তান, সংসার -

কিন্তু আছিস কেমন ?

ভাল আছি বললে বিশ্বাস করবে না ?

কেন করব না—বলিয়া যমুনা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল, একদিনও যদি ভাল থাকা যায় সেই খুব।

ছেলে মেয়ে দুইটী উঠিয়া বাহিরে আবার খেলা করিতে চলিয়া গেল। তাহার দিকে তাকাইয়া সুমিত্রা বলিল, বুঝলাম না।

যমুনা কহিল, আনন্দে আছিস ত ?

কি ভাবিয়া সুমিত্রা বলিল, তা নিজেই জানি নে। এমনি দিন চলে যায়। কিন্তু আনন্দে নেই বা কেন ?

যমুনা একটা বালিশে ভর দিয়া আড় হইয়া শুইল। জানালার বাহিরে এখান হইতে কয়েকটা বাব্‌লা গাছের সারি দেখা যায়। তাহার ওদিকে মাঠ, মাঠের পর মাঠ, মাঝখান দিয়া রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে একখানা গ্রাম, কয়েকখানা মাটির ঘর, ইতস্তত কয়েকটা গৃহপালিত গরু ও ছাগল, গুটি কয়েক গাছের জটলা; তাহারই পাশ দিয়া বিস্তীর্ণ ভুট্টার ক্ষেত আরম্ভ হইয়াছে। যমুনা সেই দিকে চাহিয়া মনে মনে খানিকক্ষণ সুমিত্রার কথাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিল তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামিলে সুমিত্রা কহিল, বিয়ের বয়স যে গেল!

গেল নাকি? এলই বা কখন্, গেলই বা কবে?

সুমিত্রা কহিল, ঠাট্টা রাখ্।

যমুনা কহিল, বেশ ত, একটা পাত্র জুটিয়ে দে। মাসিমা ত পারলেন না।

এও তোমার ঠাট্টা! সত্যি কথা বল্।

তবে এই চুপ করলাম।—বলিয়া হাসিয়া যমুনা নিজের মুখে আঙুল টিপিয়া ধরিল।

সুমিত্রা বলিল, খুব সাহস তোমার যা হোক। একলা এই দূর দেশে···সঙ্গে কেউ নেই—যদি বিপদ আপদ ঘট্‌ত?

বিপদ কিসের?

মেয়ে মানুষের বিপদ কিসের হয়?

মৃদুকণ্ঠে যমুনা কহিল, মানুষকে এত অবিশ্বাস নাই বা করলাম!

ইহার উপর আর কথা চলে না, সুমিত্রা চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে যমুনা পুনরায় কহিল, ভয় তাদেরই বেশি, বাইরের আলো যাদের চোখে পড়ে নি। বাইরে যদি বিপদ থাকে, ঘরে আছে মৃত্যু!

সুমিত্রা চোখ পাকাইয়া বলিল, এবার তবে বিলেত যা?

সুবিধে পেলেই ত যাই। বলিয়া যমুনা হাসিতে লাগিল।

রাগ করিয়া সুমিত্রা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া গেল। তারপর কহিল, তবু তোকে যখনই দেখি, হিংসে হয় যমুনা। এক যাত্রায় আমাদের পৃথক ফল হোলো।

সুমিত্রার একটা হাত টানিয়া লইয়া যমুনা কিয়ৎক্ষণ নাড়াচাড়া করিল, তারপর বলিল, উল্টোটাও ত হতে পারে? তোকে দেখে আমার হিংসে হয় না কি ক'রে বুঝলি? তোকে দেখেই ত হিংসে হবার কথা!—চল্ ওঠ্, তোর ঘরকন্না দেখি। দেখি কি নিয়ে তোরা থাকিস।

হাত ধরিয়া সে সুমিত্রাকে টানিয়া তুলিল।

ছোট বাড়ী, ছোট সংসার। মাঠের মাঝখানে একান্তে ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করে। সমস্ত বাড়ীটায় একটি পরিচ্ছন্ন লক্ষ্মীশ্রী বিদ্যমান। এঘর হইতে ওঘরে দুই বন্ধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যমুনার চোখে শুধু আনন্দই নয়, বিস্ময় এবং কৌতূহলের সহিত নির্ম্মল কৌতুক মিশিয়া দপ্ দপ্ করিতেছিল। সে রান্নাঘর দেখিল, শুইবার ঘর দেখিল, ভাঁড়ার ঘরে ঘুরিয়া

আসিল, খাইবার ঘরে পায়চারি করিল, পরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, ছাতের সিঁড়ি কোন্‌টা? ওইদিকে বুঝি? আর ওটা বুঝি বৈঠকখানা? চল্ তোদের বৈঠকখানা দেখে আসি।

বাহিরের একটা ঘরে ঢুকিয়া যমুনা সটান একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সুমিত্রা সুমুখের চেয়ারটায় বসিয়া বলিল, তুই ত ঘরকন্না দেখচিস নে, মনে হচ্ছে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিস।

তাই নাকি? বলিয়া যমুনা টেবিলের উপর কয়েকখানা কাগজ ও মাসিকপত্র লইয়া একবার নাড়াচাড়া করিল, তারপর সেগুলি ঠেলিয়া রাখিয়া ঘরের চারিদিকে ছবিগুলির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কহিল, একটাও দেশী ছবি নেই! তোরা কি জাত রে?—বলিয়া সে হাসিল।

ওঁর বোধ হয় দেশী ছবি পছন্দ হয় না। সুমিত্রা বলিল।

ওঁর হয় না, কিন্তু তোর? স্বামীর পায়ে বুঝি সর্ব্বস্ব দিয়েছিস? বলিয়া যমুনা আবার হাসিল।

সুমিত্রা একটু লজ্জিতই হইল।

দুইজনে উঠিয়া আবার ঘরের বাহিরে আসিল। এখান সেখান ঘুরিয়া বেড়াইল, তারপর যে খালি জায়গাটুকুতে কয়েকটা গাঁদার চারা বসানো হইয়াছে তাহারই পাশে আসিয়া দুইজনে দাঁড়াইল।

যমুনা বলিল, বেশ আছিস। সবই তোদের আছে, শুধু একটি জিনিস নেই, সে হচ্ছে হিঁদুয়ানী।

সুমিত্রা তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই সে পুনরায় কহিল, ঠাকুর ঘর না থাকলে কি গেরস্ত মানায় রে?

সুমিত্রা এবার হাসিল। হাসিয়া বলিল, ঠিক কথা, এতক্ষণ ভুলেই গিছলাম বলতে। তোর সে সব খেয়াল আছে নাকি এখনো? বোর্ডিংয়ে থাকতে তোর আহ্নিক পুজো আর গীতাপাঠ নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হোতো! সে নেশা তোর এখনো কাটে নি?

যমুনা সলজ্জভাবে একবার এদিক ওদিক তাকাইল। তারপর বলিল. মুখপুড়ি, ও যে শেযাকুলের কাঁটা, ফুটলে কি আর বেরোয়?

চোখ পাকাইয়া সুমিত্রা বলিল, ওই নিয়েই তা হলে থাকবি, সংসার করবি নে?

যমুনা বলিল, যা করেছি এ তা হলে সংসার নয়?

না এতে কী সুখ তোর?

যমুনা হাসিয়া চুপ করিয়া গেল। বলিল থাক্, এরপর কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে।

সুমিত্রা কহিল, সাপ যদি বেরোয় ত বেরুক, তুই বল্. বলতেই হবে তোকে।

যমুনা কহিল, তুই সেদিনকার মত তেমনি একগুঁয়েই আছিস্।

কিন্তু এ যে বলা যায় না। কিছু না থাক্‌লেও লোকে সুখে থাকে কেন, আর অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়েও মানুষ দুঃখ পায় কেন, একথা বল্‌বে কে ?

সুমিত্রা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সেই তোমার হেঁয়ালি !

সাড়াশব্দ করিয়া এমনি সময়টায় যতীন আসিয়া ঢুকিল; পিছনে সে কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া আনিয়াছে; সুমুখে দুইজনকে দেখিয়া সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, সব খবর দিয়ে এলাম সুমিত্রা, সব, যত বাঙ্গালী এখানে আছেন, দেশসুদ্ধ…

তাহার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যমুনা বলিল, কি খবর দিয়ে এলেন যতীনবাবু ?

কি খবর ? আপনি এসেছেন যে ! আপনার আবির্ভাব !

এ আবার একটা খবর নাকি ?

যতীন হাসিয়া বলিল, এই ত এখানকার আজকের খবর ! সবাই জানুক আপনি এসেছেন।

হার মানলাম আপনার কাছে।—যমুনার মুখের উপর দিয়া একটি লজ্জার আভা খেলিয়া গেল।

কিন্তু যতীন ছাড়িল না, হাসিতে দুই চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া বলিল, চাটার্জ্জি সাহেবের ওখানে গেলাম, বুঝলে সুমিত্রা ? ব্রজবাবুর মা খুব ঠাট্টা করলেন। বললেন, 'তোমার বাড়ীতে আজ দুর্গাপূজো নাকি যতীন ? এত বাজার করে নিয়ে যাচ্ছ ?' বলে এলাম, পূজো নয় দিদিমা, পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে।

এমন সময় যমুনা মুখ তুলিয়া বলিল, পুষ্পবৃষ্টি দেখতে দেখতে কুলিটা যে চলে যায় ; ওর মজুরি দিন্ ?

যতীন বলিল, ও আমার চেনা, ইষ্টিশানের কুলি।

তা বলে অমনি খাটাবেন ? বোঝা মাথায় করে' এতটা পথ—দিন্ আপনি কিছু পয়সা ওকে।

এ নির্দ্দেশ এবং আদেশ দুই। যতীন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পকেট হইতে পয়সা বাহির করিতে লাগিল। পয়সা পাইয়া লোকটা যখন সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া গেল, যমুনা তখন বলিল, আপনি ভারি হুজুগে ত ? একজন মাত্র অতিথির জন্যে আপনি এত বাজার করলেন ? দেশে ঢাঁড়া পিটিয়ে এলেন, তাঁদের নেমন্তন্ন করে এলেন না কেন ?

সুমিত্রা কহিল, তা আবার করেন নি ? দেখবে'খন রাতে লোকের কি ভীড় হয়। আমারই ঝঞ্ঝাট বাড়ল আর কি!

হাত নাড়িয়া যতীন বলিল, তুমি আজ আর কিছুতে হাত দিও না সুমিত্রা, বন্ধুকে নিয়ে থাকো, আমি এবেলা রান্না করব।

যমুনা বলিল, আপনি ? কেন ?

সুমিত্রা বলিল, ওঁর অভ্যাস আছে রে ; ছাই-ভস্ম মাঝে মাঝে এনে রান্না করা হয়। যে রান্নাটা ওঁর সব চেয়ে ওৎরায়, সেটা হয় আলুনি।

সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা উল্টাইয়া গেল। কোমরে

কাপড় জড়াইয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া যমুনা বলিল, সরুন, ঢের হয়েছে।

যতীন বিস্মিত হইয়া বলিল, ওকি, কি বল্‌চেন?

উনুনের কাছে বসিয়া যমুনা বলিল, পুরুষ মানুষের রান্না মানায় না, যান্ আপনি এঘর থেকে।

প্রবল আপত্তি তুলিয়া যতীন বলিল, সে হবে না, আপনি একদিনের জন্যে এসে—সুমিত্রা, এদিকে এসো ত?

বাহির হইতে সুমিত্রার হাসির শব্দ শোনা গেল। যমুনা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, উঠে যান বল্‌ছি নৈলে এখুনি ভয়ানক চেঁচাবো।

অগত্যা যতীনকে উঠিয়া বাহিরে যাইতে হইল। বাহিরে গিয়া সে স্ত্রীকে বলিল, তোমার কি আক্কেল? উনি রান্না করবেন?

সুমিত্রা কহিল, কর্‌লেই বা!

কর্‌লেই বা? উনি অতিথি না তোমার?

অতিথি, কিন্তু আমার বন্ধু।

ওঁর যদি রান্নার অভ্যেস না থাকে? যদি হাত পুড়ে যায়?

সুমিত্রা হাসিল। হাসিয়া বলিল, তুমি ওকে কি ভাবচ বল ত? সাধারণ কলেজে পড়া মেয়ে? সংসারে এমন কোনো বিষয় নেই, যা ও না জানে! শুধু কি রান্না, শুধু কি শিল্প-কাজ? ভগবান ওকে মেয়েমানুষ করেই পাঠান নি, মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই ওকে দু'হাতে ঢেলে দিয়েছেন।

যতীন তাহার উচ্ছ্বসিত মুখখানির দিকে তাকাইল। মনে

হইল, খানিকটা সে বুঝিতে পারিতেছে, খানিকটা তাহার কাছে অপরিচিত। মৃদুকণ্ঠে সুমিত্রা পুনরায় বলিল, ও এমনিই, ওকে সহজে বোঝবার যো নেই যে পরের সেবায় ওর বয়সটা কাটল, গরীব-দুঃখীর সংস্থান করতে ও সর্ব্বস্ব খোয়ালো। ওকি শুধু আমার মতো লেখাপড়া জানা মেয়ে? দেশের যে কোনো শ্রেষ্ঠ মনীষীর পাশে ও আসন নিয়ে বস্‌তে পারে। ওর জ্ঞানের গভীরতা, ওর প্রতিভার—ব'লো না, ব'লো না তুমি ওর কথা, ওর কথা শুন্‌তে চেও না।

সত্যি বল্‌চ সুমিত্রা?

সুমিত্রা মিনিট দুই চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল, আবেগে তাহার চোখ দুইটি সজল হইয়া আসিয়াছে। ছোট ছেলেটিকে কোলে লইয়া উঠিয়া যাইবার সময় বলিল, অথচ সব মিথ্যে হোলো ··একথা লোকে কেমন করে বুঝবে যে ওর এতটুকু আনন্দ নেই···

তাহার গলা ধরিয়া আসিল।

রাত্রে নিমন্ত্রিতের সমাগম হইল, মেয়েরা আসিয়া গান করিল, খাওয়া-দাওয়া হইল। সমস্তই যমুনার কল্যাণে। বিদায় লইয়া সবাই যখন চলিয়া গেল তখন বেশ রাত হইয়াছে।

যতীন আহারাদি করিয়া বাহিরের ঘরে একখানি বই খুলিয়া বসিয়াছিল। সমস্তক্ষণ ধরিয়া সে আদর আপ্যায়ন এবং আনন্দ করিয়াছে, কিন্তু রাত্রির নিঃশব্দ মুহূর্ত্তে কোথায় যেন একটি ব্যথা

জমিয়া উঠিতেছিল। এ বেদনা সে অনুভব করিতে পারে কিন্তু ইহার কৈফিয়ৎ তাহার ছিল না।

ছেলে-মেয়ে দুইটি ঘুমাইয়াছে। সুমিত্রা যমুনার হাত ধরিয়া তাহাকে খাইতে বসাইবার জন্য রান্নাঘরে আনিল। আনিল বটে কিন্তু যমুনা আপত্তি করিয়া বলিল, এ ত হবে না সুমিত্রা ?

সুমিত্রা বলিল, কি হবে না ?

যমুনা চুপি চুপি কি যেন বলিতেই সুমিত্রা পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, এত হোলো তবে কি জন্যে ?

কি করব বল্ ভাই !

আমি তবে ওঁকে ডেকে আনি। বলিয়া সুমিত্রা উঠিবার চেষ্টা করিতেই যমুনা তাহার হাত ধরিয়া আবার বসাইল। বলিল, ছিঃ সব কথা স্বামীকে বল্‌তে নেই।

সুমিত্রা বলিল, কবে থেকে ছেড়েচিস্ ?

অনেকদিন। আর কিছু জিজ্ঞেস করিস নে ভাই।

মরবি যে, চোখ কানা হবে।

যমুনা হাসিল। বলিল, তা হলে খুসীই হতাম। যাক্, তুই এখন খেতে বোস্ দেখি !

সুমিত্রা বলিল, আমিও তবে খাবো না। তোর এই ব্যবহার—

অনেক সাধাসাধি এবং অনুনয়-বিনয়ের পর যমুনা তাহাকে খাইতে রাজি করাইয়া বসাইল। সামান্য ফলমূল এবং মিষ্টান্ন লইয়া যমুনা তাহার পাশেই বসিল। মুখে তাহার হাঁসি ফুটিয়াছিল।

দুই বন্ধুতে বসিয়া আহারের আনন্দ ভুলিয়া গিয়াছিল, কোনো-ক্রমে গলাধঃকরণ করিয়া সুমিত্রা তাহার সহিত উঠিয়া পড়িল।

রাত্রি সেদিন অন্ধকার। শুক্লপক্ষের চন্দ্র কিছুক্ষণ আগে পশ্চিম দিকে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহারই আভায় আকাশের অগণ্য নক্ষত্র জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। প্রথম হেমন্তের স্নিগ্ধ বাতাস থাকিয়া থাকিয়া বহিয়া যাইতেছিল। অদূরে ষ্টেশনের উজ্জ্বল আলোর আভাস বারান্দার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ আগে শেষ ডাক-গাড়ীখানা বাঁশী বাজাইয়া পার হইয়া গিয়াছে।

ছেলে মেয়ে দুইটিকে স্বামীর পাশে যত্ন করিয়া শোয়াইয়া সুমিত্রা আসিয়া এঘরে ঢুকিল। যমুনা জানালার বাহিরে তাকাইয়া ছিল, মুখ ফিরাইয়া কহিল, একি, আবার এলি যে?

সুমিত্রা বলিল, একটা রাত স্বামীর পাশে না শুলেও চল্‌বে। বলিয়া সে বড় বিছানায় পাশাপাশি দুইটি বালিশ সাজাইয়া পুনরায় কহিল, আয় শুবি আয়। ট্রেণ থেকে নেমেচিস্।

বিছানায় আসিয়া শুইয়া যমুনা বলিল, একদিনের জন্যে এসে তোকে কত কষ্ট দিয়ে গেলাম বল্ ত?

সুমিত্রা বলিল, কষ্ট ত দিলি নে, দিলি দুঃখ। কষ্ট তুই নিজেই পেয়ে গেলি।

পাশাপাশি দুইজনে শুইয়াছিল, একটা হাত দিয়া সুমিত্রাকে জড়াইয়া ধরিয়া সে কহিল, কি দুঃখ তোকে দিলাম শুনি?

কি দুঃখ তা তুই কি জান্‌বি, এখনও ত মা হোস্ নি।

সন্তান অবাধ্য হ'লে মায়ের কী যে শাস্তি—সুমিত্রার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। ইহার উপর আর কথা চলে না। তবু কেমন করিয়া জানি না, সুমিত্রার বুকের উপর হাত রাখিয়া যমুনার মনে হইতে লাগিল, ইহার অন্তঃকরণে অপরিমিত মাতৃস্নেহ যেন নিরন্তর স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। সে ধীরে ধীরে কহিল, বল্ আমি তোর জন্যে কি করতে পারি?

কিছুই না—ধরা গলায় সুমিত্রা বলিল, আমি শুধু ভাবচি তুই ভেসে ভেসে কোথায় চলে গেছিস্; তোর দিন কাটে কি নিয়ে, তুই কি ভাবিস্, কি করিস্, কিছুই বোঝবার যো নেই।

যমুনা হাসিয়া বলিল, আমাকে এত নিঃসম্বলই বা ভাবিস কেন?

না ভেবে কি করি? পরের কাজে যাদের জীবন, নিজের জীবনে তারা ত কাঙাল, এত দেখতেই পাচ্ছি চারদিকে!

আমি কি একটা ভয়ানক পরোপকারী ব্যক্তি? তা ত নই!

সুমিত্রা বলিল, তুই যে তার চেয়েও বেশি, সকলের জন্যে যে তুই ভাবিস্। চিরকাল তোকে দেখে আসচি—

তাহার কথা সম্পূর্ণ উড়াইয়া দিয়া যমুনা বলিল, সব ভুল, মুখপুড়ি, সবই তোর ভুল। নিজেকে নিয়েই আমি থাকি, নিজেকে নিয়েই আমার আনন্দ। দুঃখ? এতটুকুও না! দুঃখ পেতে যাবো কেন? একটানা আরাম ত আমি চাই নে

কোনোদিন? আমার ভাল লাগে একটি সুন্দর সকাল একটু দক্ষিণে হাওয়া, একটুখানি বন্ধুত্ব; আমি ভালবাসি নরম বিছানা, একখানি সুপাঠ্য বই, কিছু গানের সুর, আর মাঝে মাঝে নতুন দেশে বেড়িয়ে আসা। আমার আশা যখন কিছু নেই তখন দুঃখই বা থাকবে কেন? যা পেলাম সেই ত আমার আশাতীত, সেই ত আমার লাভ?

সুমিত্রা বলিল, এ কি তুই সত্যি বিশ্বাস করিস্?

সত্যিই বিশ্বাস করি, কিছুই আমার পাবার কথা নয়! পাবার নয় বলেই যা পাই তাইতেই আমার আনন্দ! আমার আনন্দ অতি অল্পে।

এ ত তোর অভিমান ভাই!

অভিমান? তা জানি নে। এই আমার মনের কথা।

সুমিত্রা বলিল, আমাকে কথা দিয়ে যা, এবার গিয়ে সংসার করবি? তোর উপযুক্ত পাত্রের ত অভাব নেই যমুনা?

বালিশের ভিতর মাথা গুঁজিয়া যমুনা বলিল, এবার ঘুমোতে দে, রাত এর পর ফুরিয়ে যাবে।

দুইজনেই নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল কিন্তু সুমিত্রার চোখে ঘুম আসিতে চাহিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যমুনা তাহাকে জড়াইয়া শুইয়া থাকিলেও এ মেয়েটি সকলের নিকট হইতে বহুদূর কোন্ অজ্ঞাতপুরীতে বাস করে, ইহার নাগাল পাইবার উপায় কাহারও নাই; ইহার একাকিনী নিরুদ্দেশ যাত্রার কোনো

সঙ্গীকেও খুঁজিয়া বাহির করা অতিশয় কঠিন। ভাবিতে ভাবিতে সে অন্ধকারের দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিল।

সুমিত্রা, ঘুমোলি ?

সুমিত্রা নড়িয়া উঠিল—না, কি বল্ ?

ঘুম আসচে না বুঝি তোর ? এবার ঘুমিয়ে পড়।

ঘুম আসবে, যেদিন তোর কথা ভুলে যাবো।

ভুলেই যাস্ ভাই। বলিয়া যমুনা চুপ করিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুমিত্রা তাহার পিঠের উপর একটি হাত রাখিয়া বলিল, জীবনকে অকারণে নষ্ট হতে দেওয়ার চেয়ে পাপ আর কিছু নেই যমুনা।

যমুনা এবার হাসিল। বলিল, বিয়ে না করলেই কি জীবন নষ্ট হোলো ?

সুমিত্রা বলিল, মেয়েদের জীবন বোধ হয় তাই হয়। যার হয় না তার একটা লক্ষ্য থাকে। তোর কি লক্ষ্য আমায় বল্ ?

যমুনা আবার হাসিল। বলিল, রাত কত এখন বল্ দেখি ?

দুটো কি তিনটে হবে।

তা হলে লক্ষ্য-টক্ষ এখন থাক্, ঘুমো—বলিয়া পরম স্নেহে সুমিত্রার চিবুকটি একবার নাড়িয়া দিয়া যমুনা পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

ইহার বেশি যমুনাকে জানিবার আর কোনো উপায় ছিল না। সকাল হইতেই হাসিমুখে সে বাহির হইয়া আসিল। বেলা এগারটার গাড়ীতেই তাহাকে রওনা হইতে হইবে। স্নান করিয়া

প্রশান্ত সুন্দর মুখখানি লইয়া সে যখন আহ্নিক করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—যতীন কহিল, আজকের দিনটা থেকে গেলে হতো না ? আমি আশা কচ্ছিলাম আপনি আর একদিন—

না মশাই, আর একদিনও না। হাসিয়া সে জবাব দিল। এবং সে হাসি এমনিই যে, দ্বিতীয় অনুরোধ করিবার আর পথ রহিল না।

সুমিত্রার কাছে গিয়া বলিল, মেঘের মতন মুখ ক'রে থাকিস নে সুমিত্রা, আমার সুটকেশটা গুছিয়ে দে বলছি।

পারব না, একদিন থাকলে তোর এতই ক্ষতি হতো ?

অগত্যা যমুনা হাসিয়া হাসিয়া নিজেই গুছাইয়া লইল। বলিল, ছেলে মানুষ কচ্ছিস, তবু ছেলেমানুষি তোর গেল না মুখপুড়ি। আমার যে কাজ রয়েছে রে ?

কাজ কত তা আমি জানি, বনের মোষ তাড়ানো।

কিয়ৎক্ষণ দুইজনে কথা কাটাকাটি হইল বটে কিন্তু যমুনার যাওয়া বন্ধ হইল না। যথাসময়ে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া পায়ে জুতা পরিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। সুমিত্রা সুটকেশটা হাতে তুলিয়া লইল। যতীনও ঘরে তালা বন্ধ করিয়া ছেলেমেয়ে দুইটিকে চাকরের সঙ্গে দিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিতে লাগিল।

গাড়ী ছাড়িবার দুই মিনিট আগে সকলে ষ্টেশনে পৌছিল, টিকেট যমুনার সঙ্গেই ছিল। ছেলেমেয়েদের আদর করিয়া যথারীতি বিদায় লইতে গিয়া সময়টুকু কাটিয়া গেল। বাঁশী

বাজাইয়া দেখিতে দেখিতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ট্রেণ বহুদূর পর্য্যন্ত যখন চলিতে লাগিল, সুমিত্রা অপলক দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। ষ্টেশন ক্রমশ নির্জ্জন হইয়া গেল, যতীন তখন তাহার হাত ধরিয়া বলিল, চলো ফিরি সুমিত্রা।

সুমিত্রা চলিল। চলিতে চলিতে বলিল, কি কঠিন মেয়ে!

যতীন বলিল, কঠিন? আমার কিন্তু চমৎকার লাগল। আচ্ছা সুমিত্রা, উনি বিয়ে ত করেন নি, সংসারও নেই, কিন্তু এমন ঘুরে ঘুরে বেড়ান্ কেন বল ত?

সুমিত্রা চলিতে চলিতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, খুঁজে বেড়ায়!

খুঁজে বেড়ান্? কাকে?

একজনকেই ও শুধু খুঁজে বেড়ায়, সে ওকে পথের কাঙ্গাল করেছে! বলিতে বলিতে আকুল আবেগে সুমিত্রার গলা ধরিয়া আসিল।

আলেখ্য

বিবাহের আর মাত্র চার দিন দেরি; আজ সকালে পাকা দেখা হইয়া গেল। ধান দূর্ব্বা চন্দন ও মিষ্টান্ন দিয়া বরের বাপ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। হাতে দিলেন আংটি, গলায় দিলেন পুষ্পহার এবং কন্যার মাতুলকে দিলেন পাঁচটি মোহর। পারিবারিক প্রথা অনুসারে বরের পাকা দেখা আগেই হইয়া গিয়াছিল।

বরের পিতা কহিলেন, তবে বলি বেয়াই, পাকা দেখা হয়ে গেল, বলতে এখন আর বাধা নেই—

কন্যার মাতুল হাসিয়া কহিলেন, বলুন না শুনি।

হ্যাঁ, বলব। বরের বাপ ব'লে নিজের দর বাড়াব না কিন্তু এমন মেয়ে যে এত সহজে পাব এ আমি আশাই করি নি।

মাতুল কহিলেন, আমাদের ভাগ্য, আপনি যে পুত্রবধূকে সোনার চক্ষে দেখবেন এ যে কতখানি সুখের কথা—

সুখের কথা সন্দেহ কি। কিন্তু ভাগ্য কেবল আপনারই নয়, আমার সুশীলও অনেক সৌভাগ্যে পাবে এমন সোনার প্রতিমা। কি বলুন ঠাকুরমশাই?

পুরোহিত বসিয়াছিলেন পাশে, তিনি সহাস্য মুখে কহিলেন, বটেই ত।

কন্যা প্রণাম সারিয়া উঠিয়া পলাইয়া গেল।

তাহার পর দেনা-পাওনার সম্বন্ধে কথা উঠিল। পিতা কহিলেন, এতদিন ধ'রে যা চেয়েছিলুম তা পেয়েছি। আপনারা কেবলমাত্র দেবেন দু'গাছি শাঁখা, বাস্, তাতেই চল্‌বে।

আজ্ঞে, সে কি কথা? আমাদেরও ত আদরের মেয়ে। কিছুই যদি না দিই, মেয়ের মায়ের মন শুন্‌বে কেন বলুন? আর এই ত একটি মাত্র মেয়ে, এর মায়ের ইচ্ছে ঘটা ক'রে মেয়ের বিয়ে দেন্। ঈশ্বরের কৃপায় অভাব ত আর কিছু নেই!

পিতা হাসিয়া কহিলেন, আমারও অভাব নেই, বেয়াই। যা আছে ছেলে দুটোর চিরকাল ভালো ভাবেই কেটে যাবে, যদি ওরা সম্পত্তি না নষ্ট করে। যথেষ্ট আছে, বেয়ান নিজে বিধবা, তাঁকে এত বেশী খরচপত্র করতে মানা করুন।

মাতুল একবার অন্দর মহলের দিকে তাকাইলেন, পরে কহিলেন, কিছুতেই আমার ভগ্নী শুনবেন না। মেয়েকে সোনা দিয়ে না সাজালে কোনোমতেই ওঁর মন উঠবে না।

পিতা কহিলেন, মজা মন্দ নয়! বরপক্ষ পণ চাইছে না, অথচ কন্যা পক্ষ নাছোড়বান্দা, যৌতুক তাঁরা দেবেনই, কেমন?

যৌতুক আর কি বলুন, মাত্র গা-সাজানো গয়না। তবু ত নগদ টাকা আপনারা ছুঁলেন না।

পিতা কহিলেন, কি করব টাকা নিয়ে বেয়াই, আশীর্ব্বাদ করুন সুশীলকে, তাতেই হবে।

ইহার পর জলযোগের পালা। উভয় পক্ষই যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন, তাহার চেহারা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ পাইল জলযোগের সমারোহে। পাকা দেখায় যখন এমন ঘটা, বিবাহ-দিনের আভাসটা এখন হইতেই বোধগম্য হয়। প্রণামী এবং লোকবিদায়ে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হইয়া গেল তাহাতে মধ্যবিত্ত ঘরে একটি কন্যা পার হইতে পারিত।

আনন্দ এবং অভিনন্দনের ভিতর দিয়া সেদিন বরপক্ষ বিদায় লইলেন।

নির্দিষ্ট তারিখে বিবাহের লগ্ন আসিয়া দাঁড়াইল। সকাল হইতে বাড়ীর ফটকের মাচানের উপর সানাই বাজিতেছে। ঐশ্বর্য্যশালীর আত্মীয় ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা স্বভাবতই বেশি, অতএব নরনারীর ভিড়ে বাড়ীখানা গম গম করিতেছে। পাড়ার লোক সচকিত। কাঙ্গালী হইতে রাজাউপাধি-ভূষিত ব্যক্তি পর্য্যন্ত আজিকার এই পরিস্ফীত উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সূর্য্যের আলো নিষ্প্রভ হইতে না হইতেই বড় বড় আলো জ্বলিয়া উঠিল। ইলেকট্রিকের আলো ঘুরাইয়া পথের পথিককে পর্য্যন্ত 'স্বাগতম্' জানানো হইতেছে। অকারণ বাহুল্য এবং আড়ম্বরে এই উৎসবের ঔদ্ধত্য যেন সগর্ব্বে ডাকিয়া বলিতেছে, আমার দিকে ফিরিয়া তাকাও। শুভানুধ্যায়ীগণ ঈর্ষায় জর্জ্জরিত হইতেছিল।

ধনাঢ্যা এক নারীর একটি মাত্র কন্যার আজ বিবাহ। কন্যার পিতা নাই, তিনি ছিলেন প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী—অপরিমেয় সম্পত্তির মালিক। তিনি একদা অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে ইহলীলা সম্বরণ

করিযাছেন। স্ত্রীর বয়স এখনও অল্প—তিনি অন্দরমহলবাসিনী বিধবা, সঙ্কোচে এবং লজ্জায় তিনি কুণ্ঠিত, তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সামান্যই।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে আজ তিনি উপবাসে আছেন। নিজ হাতে তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন। এমন উপবাস করা তাঁহার অভ্যাস—পালা-পার্ব্বণ, একাদশী, অমাবস্যা—ব্রাহ্মণকুলের বিধবা হইয়া উপবাস না করিলে তাঁহার চলে না। দেবতা ব্রাহ্মণে তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তাঁহার দানের হাত এ পল্লীতে সর্ব্বজনবিদিত। পথের ভিখারী হইতে দরিদ্র স্কুলের ছাত্র, কেহই তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া বঞ্চিত হয় না। সকলের শুভাশুভের প্রতি সর্ব্বদা তাঁহার সজাগ দৃষ্টি।

একটি মাত্র কন্যা, তাহারই বিবাহ। এই কন্যা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু বিধি বাম। নগরের এক ধনীর পুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ হইতেছে, তাহারা সম্পত্তির কিছুই গ্রহণ করিতে চায় না, ইহা তাঁহার পক্ষে ক্ষোভের কথা। ভবিষ্যতে এই সম্পত্তি লইয়া তিনি কি করিবেন ? তাঁহার জামাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হইলেই ভালো হইত।

ইতিমধ্যেই নানাদিক হইতে নানা প্রস্তাব তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দেশের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বহু লোক তাঁহার নিকট আবেদন জানাইতেছে।

বিবাহ চুকিয়া গেলে সম্ভবত তিনি দানের খাতা খুলিয়া

সকলকে পরিতৃপ্ত করিবেন। আবেদনকারীদের প্রায় সকলেই আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। তাহাদের অনেকে আবার আজিকার উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াও আসিয়াছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। বর আসিতে আর বিলম্ব নাই। সবাই উদ্বিগ্ন আনন্দে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া সোরগোল করিতেছিল। কোথাও হাসি ও উচ্ছ্বাসের প্রবল বন্যা চলিযাছে, কোথাও বসিযাছে সমাজ ও রাজনীতি, কোথাও কাব্য ও সাহিত্য, কোথাও ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের অবিরাম বাণ-বিনিময চলিতেছে। ফুলের মালা, গোলাপ জল, সুগন্ধি বিলাস-বস্তু, ধূপ ও চন্দন, কেয়াপান, স্নিগ্ধ সুস্বাদু পানীয—সমস্ত মিলিয়া বিবাহের বিরাট আসর জম্ জম্ করিতেছিল।

অন্দর মহলেও এই। সেখানে আবার বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ। মায়াকাননের নন্দিনীর দল, নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুলগুলিকে সযত্নে চযন করিয়া আনা। অলঙ্কারের কনকিঙ্কিণী, সাজসজ্জা ও অঙ্গবাসের প্রদর্শনীক্ষেত্র, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যের তীর্থসঙ্গম। চাপা হাসি, টুক্‌রা কথা, চুড়ির আওয়াজ, কাঁচের প্লেটের শব্দ, সঙ্গীতালাপ, কিন্নরকণ্ঠের নিক্কন—এ যেন কোন্ এক রূপলোক। তাহাদের চারিদিকে জ্বলিতেছে উজ্জ্বল আলো, হীরা জহরতের দৃষ্টি-বিভ্রান্তকারী চাকচিকা, লঘু পদধ্বনি, রূপকুমারীসুলভ মনোমুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গী—যেন সমস্তটা মিলিয়া আজিকার উৎসব-দেবতার আগমন প্রতীক্ষার মুহূর্ত্ত গণনা করিতেছে।

দিবাস্বপ্ন

বর আসিতেছে, হঠাৎ এই সংবাদ প্রচারিত হইল। বাজিয়া উঠিল শত শঙ্খ, উঠিল আনন্দ হুলুধ্বনি, ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। প্রাসাদের চূড়ায় অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল সহস্র বিদ্যুৎ-বর্ত্তিকা, আকাশের অন্ধকার আলোয় ভাসিতে লাগিল। সানাই ধরিল মূলতান।

বর আসিতেছে। কোলাহলে রাজপথ পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। দূর পথে শুনা যাইতেছে বাদ্যরব। আলোয় চারিদিক প্লাবিত। বত্রিশ ঘোড়ার উপরে চতুর্দ্দোলা, তাহার উপর বর, বরের দুই পাশে চামর হাতে লইয়া সুন্দরী দুই সখী মধুর হাসি হাসিয়া ব্যজন করিতেছে। রাজপথের নরনারী লাজ বর্ষণ করিয়া জানাইতেছে অভ্যর্থনা, পুলিশ প্রহরীরা জনতা সংযত করিতেছিল। যান বাহনের জটলায় জনসাধারণ প্রতিহত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বর আসিতেছে—অলঙ্কারের কনকিঙ্কিণী বাজিয়া উঠিল, অঙ্গ সজ্জার বিস্রস্ত মর্ম্মর শুনা গেল, টাকা পয়সার ঝম্ ঝম্ শব্দ হইতে লাগিল। হীরা জহরতের দল হাসিয়া উঠিল। একদিকে পুষ্পবৃষ্টি, অন্যদিকে গোলাপ জলের বর্ষা।

বর আসিতেছে। আলো, আলো। মকরচূড় মুকুট মাথায় আসিতেছে আজিকার উৎসবের নায়ক, জয়রথে চড়িয়া অশ্ববল্গা ধরিয়া আসিতেছে বীরবর—আলো চাই, আলো। চারিদিক আলোয় আলোয় প্লাবিত হোক। তপস্বিনী কন্যাকে রথে তুলিয়া যে পলাইবে, বন্ধুর বেশে আসিতেছে সেই দস্যু-দেবতা! আসিতেছে

ঝড়, উৎসবকে পদদলিত করিয়া, গৃহলক্ষ্মীকে হরণ করিয়া হাসিমুখে পলাইবে সেই দিগ্বিজয়ী পরস্বাপহারী—আলো জ্বালাইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে হইবে।

বর আসিল। মঙ্গলগান গাহিয়া উঠিল, শঙ্খ বাজিতে লাগিল, হুলুধ্বনির শব্দে কানে তালা লাগিয়া গেল।

সুকোমল রাঙা মখমলের শয্যায় বরকে আনিয়া বসাইল। রূপবান রূপকুমার। দূরের স্বপ্ন তাহার চক্ষে, মুখে সলাজ স্মিতভাব, সর্ব্বাঙ্গে অগণ্য জহরৎ, মাথায় টোপর। ঐশ্বর্য্যশালীর পুত্র। নন্দন-কাননের মায়াবী ইন্দ্র দেবতা।

* * * * *

বিবাহ লগ্নের আর বিলম্ব নাই।

উৎসবের পিছনে থাকে আহারের প্রচুর আয়োজন। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। রান্না ও ভাঁড়ার লইয়া যাহারা ব্যস্ত, তাহারা শব্দই শুনিবে, দৃশ্য দেখিবার ভাগ্য তাহাদের ঘটে না। টাকার শব্দ, গহনার আওয়াজ, প্রসাধন সজ্জার মর্ম্মর, উপর তলার পদধ্বনি, বাহিরের বাদ্যরব—ইহাদেরই দিকে তাহারা উৎকর্ণ হইয়া ফিরিয়া আছে।

এমন সময় সেই কোলাহলের ভিতর দিয়া একটি যুবক কুণ্ঠিত পদে আসিয়া ভিয়ান্ ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইল, তারপর সন্ত্রস্ত দৃষ্টি এদিক ওদিক ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, ছোড়দি, ও ছোড়দি।

ছোড়দি তাহাকে দেখিয়া মৃদু হাসিমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্পবয়স্কা একটি তরুণী, নিরাভরণা, সামান্য পরিচ্ছদ, কেবল বাঁ হাতের আঙুলে একটি তামার অঙ্গুরী। কহিল, কি খবর? এমন সময় এলি যে, চাক্‌রিটা হোলো নাকি?

মাথা হেঁট করিয়া যুবকটি বলিল, সুপারিশ না হ'লে সে কাজ হবে না।

ছোড়দি করুণ অপলক চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। যেন একটা ভয়ানক আশা তাহার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেছে।

চারিদিকে তখন অবারণ কোলাহল। ছেলেটি কহিল, যাক্ গে, শোনো বলি। ডাক্তারের টাকা আজ শোধ না দিলে কাল তিনি আসবেন না জানিয়েছেন। টাকা তুমি দাও ছোড়দি।

কেমন ক'রে দেবো? পরের বাড়ী রাঁধতে এসেছি, টাকা পরের হাতে। চেয়েও ছিলুম একবার কিন্তু এরা বললে, কাজকর্ম্ম চুকে না গেলে কিছুতেই দিতে পারবে না। পরে বুঝবে কেন পরের অভাবের চেহারা?

ছেলেটি চলিয়া যাইতেছিল, ছোড়দি আবার ডাকিয়া কহিল, রান্না ত আজ হয় নি বুঝতেই পাচ্ছি। খাস্ নি ত কিছু? দাঁড়া—

বলিয়া সে রান্না ঘরের ভিতরে গেল এবং মিনিট দু'য়েকের মধ্যে একটা মাটির পাত্রে কিছু খাবার আনিয়া ছেলেটির হাতে

দিয়া কহিল, কোঁচার খুঁট ঢাকা দিয়ে একপাশ দিয়ে চ'লে যা। আমি এখন বড় ব্যস্ত, আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে।

তুমি খাও নি এখনো ?

দূর্ পাগ্লা, আজ একাদশী যে—বলিয়া ছোড়দি শীর্ণ হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

অন্দর মহল হইতে বাহির হইয়া একপাশ দিয়া ছেলেটি চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ভিড় বাঁচাইয়া ফটকের কাছাকাছি আসিতেই হঠাৎ যেন কাহার ধাক্কায় মাটির পাত্রটা নাড়া খাইয়া পড়িয়া গেল।

উজ্জ্বল আলোয় কিছুই আর গোপন রহিল না—মিষ্টান্ন, লুচি, তরকারী ছড়াইয়া পথের মাঝখানটা একাকার হইয়া গেল।

ছেলেটি বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল, অনেকে বক্র হাসিয়া তাকাইল তাহার দিকে। একজন তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, কে হে তুমি ?

সে কম্পিত কণ্ঠে কহিল, এখানে আমার দিদি চাকুরি করেন।

খাবার পেলে কোথায় ?

তিনি দিয়েছেন।

তিনি কা'র হুকুমে বাইরে খাবার পাঠাচ্ছেন ?

ছেলেটি চুপ করিয়া রহিল।

ভদ্রলোক কহিলেন, গোপনে লুটপাঠ চল্ছে, কেমন ? ভারি মজা পেয়ে গেছ তোমরা। দাঁড়াও, এর ব্যবস্থা করছি। রাগে গম্ গম্ করিতে করিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

দিবাস্বপ্ন

অপমানে আত্মগ্লানিতে ছেলেটি আর এই অত্যুগ্র আলোয় জনতার মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিল না, মাটির পাত্রের সহিত যেন একটি পরিবারের দুঃসহ দারিদ্র্য চুরমার হইয়া সকলের সম্মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কম্পমান দুইটা পা কোনোমতে টানিয়া টানিয়া সে পথে নামিয়া একদিকে চলিতে লাগিল।

'জংলা শাড়ী'

কলুটোলা ষ্ট্রীট দিয়া চলিতেছিলাম। রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। একটু আগে বর্ষা নামিয়াছিল, পথে এখনো জল শুকায় নাই; গ্যাসের আলোগুলিতে বৃষ্টির ছাট লাগিয়া এখনো ঝাপ্সা হইয়া আছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশে মেঘের আয়োজন কমে নাই।

শশধর আর আমি, দু'জনে চলিতেছিলাম। বৃষ্টি-বাদলের দিনে পথে পথে বেড়াইতে আমরা দুইজনেই পছন্দ করি। কোঁচার খুঁট্ হাতে তুলিয়া ডাল-মুট্ কিনিয়া চিবাইতে চিবাইতে গড়ের মাঠের দিকে যাইতেছিলাম। জামা কাপড় কিছু ভিজিয়া গিয়াছে, মাথার চুল দিয়া জল পড়িতেছিল, জুতা ভারি হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু টাট্‌কা ডাল-মুটের নেশায় মশগুল হইয়া আমরা চলিয়াছি। আমি একজন কেরাণী এবং শশধর এক মোটরের কারখানায় য়্যাপ্রেন্টিসগিরি করে, তৎসত্ত্বেও এই বর্ষার রাত্রে পথে চলিতে চলিতে আমরা দুইজনে রবি ঠাকুরের বর্ষা-কবিতার আলোচনা করিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন কেরাণী, অন্যজন মিস্ত্রি, অতএব জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পথ আমরা মাড়াই না, তাই এই কথাই বলিতে বলিতে চলিয়াছি যে, রবিবাবু বড়লোক বলিয়াই ভালো কবিতা লিখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আমাদের এই

ধারণা গ্রহণযোগ্য কি না, তাহা পরজন্মে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর হইয়া বিবেচনা করিব।

গল্প করিতে করিতে চিত্তরঞ্জন আভেন্যুর কাছাকাছি আসিয়াছি এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল, বাবু, শুন্‌চেন?

পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম। একটি ছোক্‌রা আসিয়া দাঁড়াইল। বয়স বছর ত্রিশ হইবে, চেহারাটা মন্দ নয়। গায়ে একখানা চাদর জড়ানো, মাথায় বড়ো বড়ো কোঁক্‌ড়ানো চুল, খালি পা, মুখে খোঁচা খোচা দাড়ি আর গোঁফ। এমনি চেহারার বর্ণনা রুশীয়-সাহিত্য হইতে চুরি-করা বাংলা মাসিকপত্রের ছোট গল্পে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইল। ভাবিলাম তরুণ কবিও হইতে পারে। কিন্তু আমরা ত তাহার 'মানসী' নই, তবে সে পিছু পিছু আসিল কেন? কাব্য আলোচনা করিতেছিলাম, হয় ত শুনিয়া থাকিবে, হয় ত বা কবিতা শুনাইতেই আসিয়াছে। সর্ব্বনাশ!

ছোকরা একবার এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর কহিল, শাড়ী কিনবেন বাবু?

শাড়ী! অবাক হইলাম। বৃদ্ধ হইয়াছি, শাড়ীর প্রতি এখন আর লোভ নাই। একদা অনেক শাড়ী কিনিয়াছি অনেকের জন্য, তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজত্ব করিতেন। ঝাপ্সা গ্যাসের আলোয় ছোকরার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না—

শশধর কহিল, না হে, শাড়ী-টাড়ী আমাদের দরকার নেই, অন্য কোথাও ছাখো। বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিল।

জংলা শাড়ী

চ'লে যাচ্ছেন বাবু? পছন্দ না হ'লে না নিতেন, কিন্তু একবার দেখেই যান্ না। ভালো জংলা শাড়ী, মুর্শিদাবাদ সিল্কের, দেখুন না একবার—

টাকাকড়ি আমাদের কাছে নাই, ফিরিবার সময় পুনরায় ডালমুট কিনিবার মতো আর দুইটি পয়সা শশধরের কাছে আছে। আমি কেরাণী, সুতরাং মাসের সাত তারিখ হইতেই আমার পকেটে পয়সা থাকে না; সারামাস ধরিয়া তিনু মিঞার নিকট ধারে বিড়ি কিনিয়া চালাইতে হয়। বললাম, এত অনুরোধ কোচ্ছ, আচ্ছা খোলো দেখি—কিন্তু ব'লে রাখছি, কিন্‌তে-টিন্‌তে পারবো না।

সে কি বাবু, আপনারা বড়লোক—এই বলিয়া সে চাদরের ভিতর হইতে একটা মোড়ক বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি খুলিতে লাগিল।

বড়লোক বলিয়া সে ভাবিয়াছে ইহাতে আনন্দ পাইলাম। শশধরের গায়ে একটা টিপ দিয়া সম্মান রক্ষা করিবার জন্য বলিলাম, আর ভাই, তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। এ বছর খাজনা পত্তর আদায় নেই, জমিদারির অবস্থা শোচনীয়—কি বল হে শশধর?

আমারো ভাই সেই অবস্থা, ভাবছি গাড়ীখানা বিক্রি ক'রে দেবো। শেয়ারে যদি অত টাকা না ডুবতো—বলিয়া শশধর যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল। আমার ইঙ্গিত সে বুঝিতে পারিয়াছে!

বলিলাম, তোমার আর ভাবনা কি হে, তুমি ত ঠাকুর-বাড়ীর ছেলে!

শশধর কহিল, তুমিই বা কম কি, সন্তোষের অংশীদার!

আমাদের এই মিথ্যা-বিলাস ছোক্‌রা শুনিল কি না কে জানে। সে মোড়ক খুলিয়া শাড়ী বাহির করিল। লতা-পাতা আঁকা সুন্দর সিল্কের শাড়ী, বারো-চৌদ্দ টাকা দাম হইতে পারে। শাড়ীর দুইটা পাট সরাইয়া সে দেখাইয়া দিল, ইহার সহিত ব্লাউস-পিসও আছে। দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, দামটা কত একবার শুনেই যাই?

ছোক্‌রা কহিল, আপনারা বড়লোক, আপনাদের কাছে কিছুই নয়। আট টাকা দেবেন···শুনুন বাবু, চলে যাবেন না, আপনারা কত দেবেন ব'লেই যান্ না?

চলিতে চলিতে শশধর কহিল, দু'টাকা পাবে।—বলিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। সে রাজি না হইলেই আমরা বাঁচি, মাস-কাবারের পূর্ব্বে টাকার চেহারা দেখিবার মতো ভাগ্য আমাদের হইবে না। এক হাতে ডালমুট্, অন্য হাতে কোঁচার খুঁট্ ধরিয়া দ্রুতপদে চিত্তরঞ্জন আভেন্যুর ফুট্‌পাথ ধরিয়া চলিলাম। শশধর কহিল, দু'টাকা শুনে লোকটা গাল্ দেয় নি এই রক্ষে।

বলিলাম, দুটো গালই না হয় দিত, অপমান ত' আর করতো না?

বড় রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছি। চলিতে চলিতে বৌবাজারের

মোড় পার হইয়া গেলাম। আকাশে বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে। বাঁ-হাতি একটা রেস্তঁরার সুগন্ধ নাকে আসিয়াছে, এমন সময় শশধর কহিল, ওহে, লোকটা পিছু পিছু আস্‌ছে, মতলব কি বলো ত?

ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। ছোকরা আবার কাছে আসিল। তাহার ধৈর্য্যের প্রশংসা করিতে হয়। বলিলাম, কি হে, তুমি যে নাছোড়বান্দা? আমাদের কি ঠাউরেছ বলো দেখি?

সে কহিল, আর কিছু বাড়িয়ে দিন্ বাবু, এমন ভালো শাড়ী, বাজারে এর দাম বারো টাকা।

শশধর কহিল, চোরাই মাল কোথা থেকে এনেছ শুনি?

ছোক্‌রা কহিল, বুঝতেই পারেন ত বাবু, গরীব লোক—

আমি বলিলাম, দ্যাখো, ভালো কথায় বলছি, দু'টাকা পাবে। যদি ইচ্ছে হয় দিয়ে যাও—নৈলে পিছু পিছু এসো না, পুলিশে ধরিয়ে দেবো। চোরাই মাল বিক্রি করা তোমার বার কোরবো। বদ্‌মায়েস্!

সে কহিল, এমন শাড়ী বাবু—জংলা শাড়ী—

কী যন্ত্রণা! এমন বর্ষার রাত্রিটা মাটি করিয়া দিবে দেখিতেছি। কিন্তু ততক্ষণে কি জানি কেন, শাড়ীটার প্রতি মোহগ্রস্ত হইয়াছি। বলিলাম, আচ্ছা, শেষ কথা বলি। দু'টাকার বেশি কিছুতেই দেবো না, তবে তুমি যখন এতদূর ধৈর্য্য ধ'রে এসেছ, তখন আর চার আনা বক্‌শিস্ দেবো—কি করবে বলো?

শশধর কহিল, আমি বলি শাড়ী নিয়ে কাজ নেই হে।

আমারো না নেবার ইচ্ছে।—যাও হে তুমি যাও, জোর ক'রে ত আর কাপড় গছানো যায় না।

ছোকরাটা অনেক চিন্তা করিয়া শেষে পিছু পিছু আসিয়া কহিল, আচ্ছা, তবে তাই দিন বাবু, কি আর করবো। গরীব লোক, সামান্য টাকার জন্যে বিপদে পড়েছি। দিন, ন'সিকে দিয়েই নিয়ে যান্।

রাজি হইতেই আকাশ ভাঙিয়া মাথায় পড়িল। এই রাত্রে টাকা পাইব কোথায়? কে ধার দিবে? এখন না হয় কোথাও ধার করিলাম, কিন্তু মাসকাবারে বেতন হইতে দুই টাকা চার আনা দেনা শোধ করিলে আর বাকি থাকিবে কি? সারা মাস কি আঙুল চুষিয়া থাকিব? কিন্তু আর উপায় নাই, কথা দিয়া ফেলিযাছি, জংলা শাড়ী কিনিতেই হইবে। অনেক ভাবিয়া বলিলাম, খোলো দেখি আর একবার, এখানে বেশ আলো আছে। জাপানী সিল্ক হ'লে কিন্তু নেবো না, বলে রাখছি।

ছোকরা পুনরায় মোড়ক খুলিল। তাহার চাদরের নীচে বগলে আর একটা মোড়ক দেখিয়া বলিলাম, ওটায় কি আছে হে?

আজ্ঞে, এরই জোড়া, একই কাপড়। সব সুদ্ধ দুখানা নিয়ে বেরিয়েছি।

শশধর কহিল, বেশ করেছ, লক্ষ্মী ছেলে। কতদিন থেকে চুরি শিখেছ শুনি। সত্যি বলো ত, চোরাই মাল কিনা?

সে কহিল, আজ্ঞে বাবু, সবই ত জানেন।

মোড়ক তুলিয়া উজ্জ্বল আলোয় শাড়ী দেখিলাম। সত্যই কাপড়খানি সুন্দর। রাত্রির আলোয় জংলা শাড়ী যে এমন চমৎকার দেখায় তাহা আগে জানিতাম না। পুনরায় মোড়ক বাঁধিয়া নিজের হাতে লইলাম। কে বলে শাড়ীর প্রতি আজও আমার লোভ নাই? কে বলে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি? বলিলাম, পটলডাঙ্গা পর্য্যন্ত তোমাকে যেতে হবে ভাই একটু কষ্ট ক'রে, এক বন্ধুর কাছে টাকা নিয়ে তোমাকে দেবো, আমাদের কাছে এখন নেই কি না—

ছোক্‌রা খুশি হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সে যে ভদ্র এবং বিনয়ী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বহু শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চোরাই মাল বিক্রয় করিয়া রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, এই ছোক্‌রা তাহাদের চেয়ে কম ভদ্র নয়। কেবল তাই নয়, ইহার আচরণে যে ঈষৎ সাম্যবাদের গন্ধ পাইয়াছি তাহার জন্যও ইহাকে সম্মান করিবার কথা।

পনেরো মিনিটকাল হাঁটিবার পর আমার এক বন্ধুর মেসের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে আমারই বন্ধু, শশধরের সহিত তাহার পরিচয় নাই। পথের এদিকটা অন্ধকার, দূরের একটা গ্যাসের আলো সঙ্কীর্ণ গলির ভিতরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। মোড়কটা শশধরের হাতে দিয়া বলিলাম, এটা রাখো তোমার কাছে, ভেতরে নিয়ে গেলে সবাই দেখতে চাইবে। আমি এখুনি আস্‌বো।

শশধর তাড়াতাড়ি কহিল, চোরাই মাল হাতে নিয়ে আমি ভাই দাঁড়াতে পারবো না, যে দিনকাল, পুলিশের কাণ্ডকারখানা! ওর হাতেই থাকুক, ওকে নিয়ে দাঁড়াই, তুমি যাও।

বন্ধুর নিকট ন'সিকে ধার করিবার জন্য তাড়াতাড়ি মেসের দরজার ভিতর দিয়া আমি ঢুকিয়া পড়িলাম। শাড়ীটা আর আমি ছাড়িতে পারিব না। উহা কোনো আত্মীয়ের নিকট চড়া দামে বিক্রয় করিয়া ইতিমধ্যে কিছু লাভ করিবার ফন্দি আঁটিয়াছি।

টাকা পাইয়া শাড়ীখানা আমার হাতে দিয়া ছোক্‌রা চলিয়া গেল। তাহার ভয় ছিল পাছে আমরা তাহাকে ধরাইয়া দিই। দ্রুতপদে সে এক গলি হইতে অন্য গলি দিয়া অদৃশ্য হইল। জীবনে অনেক দিকে বঞ্চিত হইয়া আছি, তাহার জন্য চিত্তদাহ কম নাই, কিন্তু আজকের দিনে যে সত্যই লাভবান হইলাম তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। জ্যোতিষীকে একবার হাতখানা দেখাইয়া লইব, এতদিনে বোধ করি সুদিন আসিয়াছে। ছোটবেলায় একবার শুনিয়াছিলাম, আমি পরের ধন লাভ করিব।

শশধর চলিতে চলিতে কহিল, শাড়ীখানা দুজনে মিলে নেওয়া যাক্, কি বলো? আমি তোমাকে এক টাকা দু' আনা দেবো।

বলিলাম, তার মানে?—তাহার প্রস্তাবে রাগ হইল।

শশধর কহিল, তোমার স্ত্রী আর আমার স্ত্রী দুজনেই পরবে। ধরো আমার কাছেই যদি শাড়ীখানা থাকে?

তোমার কাছে থাকবে? তোমার স্ত্রী যদি গোপনে বেশি ব্যবহার করেন? ওটি হচ্ছে না শশধর, শেষকালে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ন'সিকের শাড়ীর জন্য বন্ধুবিচ্ছেদ সইবে না।

শশধর কহিল, তবে তুমি আমার কাছে তিনটাকায় বিক্রি করো, মাসে আট আনা ক'রে শোধ ক'রে দেবো।

তাহার এই কদর্য্য প্রস্তাবে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিলাম, এঃ—বউকে জংলা শাড়ী পরাবার কত সখ! যাও, গামছা পরিয়ে রাখো গে!

মোড়কটা হাতে ছিল, সেটাকে বাঁ হাতে বুকে চাপিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। শশধর কহিল, ধর্ম্মত ওখানা আমারই নেবার কথা, আমিই প্রথমে দু'টাকা দর বলে' ছিলুম। বুকে হাত দিয়ে বলো ত সত্যি কি না?

বলিলাম, বটে! কিন্তু মনে রেখো শশধর, পাখীকে যে ধরে পাখী তার নয়, যে বাঁচিয়ে রাখে পাখী তারই!

ধমক খাইয়া শশধর খানিকক্ষণ চুপ করিযা রহিল, তারপর কহিল, যাক গে। ভালো কথা, ছোকরাটার কাছ থেকে কিন্তু খুব বাগানো গেছে, কি বলো?

বলিলাম, চুরির মাল, যা পায় তাই লাভ!

হ্যাঁ, তুমি যাবার পর অনেক গল্প করলে, শুনছিলুম দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে। কাপড়ের দোকানে ছোঁড়া চাকরি করে, কুড়ি টাকা মাইনে পায়। চোরাই মাল বিক্রির ভাগ দোকানের সব কর্ম্মচারীই পায়, সবাই খুশি থাকলে চুরি ধরা পড়বে না। তার পর হাত সাফাইয়ের ফন্দিও চমৎকার। নিজেদের লোক আসে মাল কিন্‌তে, তার মোড়কের মধ্যে চোরাই মাল পাচার ক'রে দেয়। বাইরে এসে বিক্রি করে। বাস্তবিক, এ ছোকরাকে দেখলে দয়া হয়। বড় গরীব। বাড়ীতে স্ত্রী, দুটি ছেলে মেয়ে, বুড়ো মা, ঘর ভাড়া, রোগ ভোগ—কুড়ি-বাইশ টাকা মাইনেয় কি হয় বলো ত? চুরি করবে না ত কী করবে? সমাজের কত বড় অবিচার বলো দেখি? ওর অবস্থার জন্য তুমি দায়ী, আমি দায়ী।—বলিতে বলিতে শশধর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পরের দুঃখে বিগলিত হইয়া সে আমাকে অভিভূত করিতে চায়, তাহার অভিসন্ধি বুঝিতেছি।

বলিলাম, থামো শশধর, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এখুনি সাপ বেরুবে। আচ্ছা শোনো, শাড়ীখানা পাঁচ টাকায় বেশ সহজে বিক্রি করতে পারি, নয়?

শশধর কিছুক্ষণ চুপ করিযা সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। তারপর কহিল, ছ' টাকাতেও বিক্রি করতে পারো, যে কিন্‌বে তার লোকসান হবে না।

আনন্দিত হইয়া কহিলাম, যদি ছ'টাকায় বিক্রি হয় শশধর, তবে চাচার দোকানে তোমাকে একদিন কট্‌লেট্ খাইয়ে দেবো।

শশধর কহিল, কিন্তু বিক্রিই বা করবে কেন? স্ত্রীকে কি তোমার জংলা শাড়ী পরাতে ইচ্ছে করে না?

উত্তেজিত হইলাম। তার পায়ে সর্ব্বস্ব দিয়েছি, এ শাড়ীখানা নাই বা দিলুম! তুমি জানো শশধর, বাবা মরবার সময় আমার কী সর্ব্বনাশ ক'রে গেছেন! বিয়ে না করলে আজ আমার ভাবনা কি? আমি বিলেত যেতে পারতুম, কিম্বা পাটের কারবার ক'রে লক্ষপতি হ'তে পারতুম, কিম্বা দেশের নেতা হ'য়ে অন্তত জেলেও যেতে পারতুম।

শশধর সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, তা সত্যি, তোমার অনেক সম্ভাবনা ছিল। এই ত্যাখো আমারই কী দুর্দ্দশা! রুগ্ন স্ত্রী, মাসের মধ্যে দশদিন ম্যালেরিয়ায় ভোগে, সেদিন ত ধড়াস ক'রে একটা কানা-মেয়ে প্রসব করলে! তার ওপর ঝগড়াটে, কথায়-কথায় বাপের বাড়ী চ'লে যাবার ভয় দেখায়। তবে হ্যাঁ, চেহারাটা ভালো এই যা। ভালো কাপড় চোপড় পরালে···ধরো যদি তুমি দিতে জংলা শাড়ীখানা তা হ'লে—

মনে মনে শশধরের ফিকির বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। লোকজনের ভিড়ে পথ চলিতে চলিতে শাড়ীর মোড়কটা সযত্নে ধরিয়া আছি। সোজা বাসায় লইয়া যাইব, এমন কি আর কাহাকে দেখিতেও দিব না। কিন্তু মনে দুঃখ হইতে লাগিল, আমি শশধরের জন্য এত করিয়া থাকি, কিন্তু আমার এই সামান্য লাভটুকু তাহার প্রাণে সহ্য হইতেছে না? মুখে কেবল

বলিলাম, ভালো চেহারায় ভালো শাড়ী না পরলেও ক্ষতি নেই। ফুলের পাপড়িতে কেউ ছবি আঁকে না, বুঝলে?

শশধর কহিল, তা জানি, তবে কি জানো, একটু খুশি রাখবার চেষ্টা করি—নৈলে যে রেঁধে দেবে না।

আসল কথাটা ভাবিয়া ভয় হইতেছে। শাড়ীটা স্ত্রীর হাতে পড়িলে আর বাহির করিতে পারিব না। সুতরাং এখন বাসায় না ফিরিয়া যদি অন্য কোথাও বিক্রয় করিবার চেষ্টা করি তবে ভালো হয়। শশধর সঙ্গে আছে, যদি তাহারই সম্মুখে বেশি দামে বিক্রয় হয় তবেতাহাকে এখনই চাচার দোকানে কট্‌লেট খাওয়াইতে হইবে, কথা দিয়াছি। কিন্তু সামান্য কথার মূল্য কতটুকু? এই দুঃখের পয়সা বাজে খরচ করিব? শশধর কি আমার শ্যালক? না, তাহা পারি না। লটারির টাকা পাইলে তাহাকে কট্‌লেট খাওয়াইব, শশধর বাঁচিয়া থাকুক। বরং বাসায় একদিন তাহাকে তালের বড়া খাওয়াইয়া দিব!

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। হাঁটিতে হাঁটিতে রাস্তা ফুরাইল। শশধরকে এড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, ওহে, একটা কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, আমাকে একবার ছোট পিসিমার ওখানে যেতে হবে। তোমাকে এখানেই গুড্ নাইট্ করবো।

শশধর কহিল, তোমার আবার ছোট পিসিমা কে? কই, এতদিন ত বলো নি?

বলি নি? আশ্চর্য্য! পুঁটিবাগানের ভেতর দিয়ে যাবো,

লোহাপটির পাশ দিয়ে, চাটুয্যেদের বাড়ী—আচ্ছা, তা হ'লে এখান থেকেই কেটে পড়ি, কেমন ?—বলিয়া একটা গলির ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করিলাম।

শশধর কহিল, আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে। কিন্তু একটা কথা রাখো ভাই, শাড়ীখানা মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীকে পরতে দিয়ো। এক-একবারে না হয় দু'আনা ক'রে ভাড়াই দেবো।

তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম, আচ্ছা, আচ্ছা, সে পরের কথা, দেখা যাবে। তোমার স্ত্রী কি আর আমার পর ?

শশধর চলিয়া গেল।

অনেক চেষ্টা করিলাম, সুবিধা হইল না। পথে দু'একজনকে ধরিলাম, তাহারা চোরাই মাল বলিয়া ভ্যাংচাইয়া চলিয়া গেল। আমাদের পাড়ার অন্নদা মুদীকে ধরিলাম, সে জানাইল তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে। অবশেষে গুঁইদের বাসায় তাসের আড্ডায আসিলাম। দরজার বাহির হইতে ইসারায় পঞ্চাননকে ডাকিয়া শাড়ীখানার কথা বলিলাম। সে নূতন বিবাহ করিয়াছে, তখনই লইতে রাজি হইল। মোড়কটা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, কিন্তু সাতটাকার কম দিতে পারবো না ভাই, বাজারে এখানার দাম পনেরো টাকা।

পঞ্চানন তাসের নেশায় মশগুল হইয়াছিল। অত সহজে সে

স্বীকার পাইবে তাহা ভাবি নাই। একটু সন্দেহ হইল। সে কহিল, কাল সকালে আমার বাড়ী গেলে টাকাটা দিয়ে দেবো।

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, একবার পঞ্চাননের সহিত রানিং ফ্লাশ খেলিয়াছিলাম, সেই জুয়াখেলার দরুণ পাঁচ আনা পয়সা সে আজিও শোধ করে নাই। তাগাদা দিতে দিতে পাঁচ মাস হইয়া গিয়াছে। তাহাকে আর বিশ্বাস করি না। বলিলাম, কাল সকালে? না দাদা—বলিয়া মোড়কটা তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইলাম, বলিলাম, আজ রাত্রেই আমার টাকার দরকার। স্ত্রীর অসুখ।

তবে অন্য কোথাও দেখ্‌লে···সস্তার কাপড় যে কেউ নেবে।—বলিয়া পঞ্চানন আবার ভিতরে চলিয়া গেল।

চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কপালে লাভ নাই। ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। পাগ্‌লীর ভাগ্য ভালো, শাড়ীখানা তাহারই হইল। সংসারে যা কিছু তাহারই পায়ে ঢালিয়া দিয়াছি, এ কাপড়খানাও দিব। পায়ের শব্দ করিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। ছেলেমেয়ে তিনটিকে লইয়া উনি বোধ করি ঘুমাইয়া আছেন। ডাকিলাম, ওগো?

হঠাৎ তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, থাক্, মিষ্টি গলায় আর ডাকতে হবে না! কেলেঙ্কারীর কথা মনে নেই?

ভুলিয়া গিয়াছিলাম বিকালবেলা ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়াছি। ঝগড়ার কারণটা সামান্য। তাঁহার জন্য সোনার একজোড়া ঝুমকো গত বৎসর আনিয়া দিয়াছিলাম, আজ সকালে তাহা

কেমিক্যালের তৈরী বলিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আমি না কি তাঁকে প্রবঞ্চনা করিয়াছি। সোনা না হয় কেমিক্যালেই পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ভালোবাসাটা ত আর ফিকা হয় নাই! মেয়েমানুষ প্রেমের মূল্য কী বুঝিবে?

বলিলাম, আরে সেই জন্যই ত ডাক্‌ছি। এই নাও তার ক্ষতিপূরণ, পরো দেখি এখনি জংলা শাড়ীখানা? নাও, ধরো।—শাড়ীর মোড়কটা ছুঁড়িয়া তাঁহার নাকের কাছে ফেলিয়া দিলাম। অলঙ্কার-আভরণ দিয়াই স্ত্রীলোকের মন কিনিতে পারা যায়। এই যে এত কষ্ট করিয়া শাড়ী বহিয়া আনিয়াছি, জানি আমার এই আন্তরিকতার মূল্য কিছুই পাইব না। বাস্তবিক, জীবনটা আমার মরুভূমি! আমি সুইসাইড্ করিব।

বাহিরে আসিয়া বসিয়া তামাক ধরাইতেছিলাম, এমন সময় গৃহিণী তীব্র ও তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমার হাত হইতে কল্‌কে পড়িয়া গেল। চীৎকার করিতে করিতে তিনি বাহিরে আসিলেন—চিরজীবন আমাকে তুমি ঠকিযে এসেছ, তোমার মুখ দেখতে নেই। তুমি জোচ্চোর—বাটপাড়—চামার—

চুপ, চুপ, হোলো কি শুনি আগে?

আমার সঙ্গে রসিকতা? নচ্ছার, ইতর, চামার—আমি আফিং খেয়ে মরবো।—তাঁহার চীৎকারে পাড়া জাগিল।

তাড়াতাড়ি ঘরে আসিলাম। তিনিও পিছনে পিছনে আসিয়া মোড়কটা আমার মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়া কহিলেন,

জংলা শাড়ী ? তোমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ ! কোথায় শাড়ী বা'র করো, নৈলে আজ তোমার রক্ষে রাখবো না।

শাড়ী নেই ? তবে কি ?—বলিয়া মোড়কটা এলাইয়া কম্পিত হস্তে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতরে ছোট ছোট দুই টুক্‌রা পা-মোছা চট্ পাট করা রহিয়াছে, আর কিছু নাই ! জংলা শাড়ী কোথায় অন্তর্হিত হইল ?

কি করিব, কি বলিব, ভাবিয়া পাইলাম না। কথা বলিতে গেলাম, আওয়াজ বাহির হইল না, তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেছে। গৃহিণী অপমান করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা কানে ঢুকিতেছিল না। কোন্ ফাঁকে প্রতারিত হইয়াছি তাহাই বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

আশ্রয়

সখের থিয়েটার। ষষ্টতলার মোড়ে খালি জায়গাটায় ষ্টেজ বাঁধা হয়েছে। এই নিয়ে আজ তিন দিন ধরে পাড়ার লোকের আলাপ-আলোচনার আর অন্ত নেই। 'সীতার বনবাস' হবে।

সন্ধ্যার পরেই অভিনয়। পাড়ায় যে ছোকরাগুলির নাম নিত্য পরিচিত, যাদের দৌরাত্ম্যের নানা বিচিত্র ইতিবৃত্ত শুনতে সবাই অভ্যস্ত তারাই দেখা দেবে পৌরাণিক রূপকুমারের বেশে, মেয়ে সাজবেও তারা।

কৌতূহল সকলেরই মুখে চোখে। এবং এই দৃশ্য দেখার অধীর আগ্রহে উন্মুখ যারা, নারীর সংখ্যাই তাদের মধ্যে অধিক। বিনামূল্যে দুর্লভ দর্শন লাভ ঘটবে সুতরাং আবালবৃদ্ধবনিতার অপূর্ব্ব সম্মেলনে এই শীতের রাত্রেও ষষ্টিতলার মাঠ সমুদ্রের মতো মুখরিত।

যবনিকা উঠতে আর দেরি নেই। এ পাড়ার সম্ভ্রান্ত মেয়ে যাঁরা, একটি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নিয়ে তাঁরা বসেছেন সব চেয়ে সুবিধাজনক জায়গাটিতে, তাঁরা পেয়েছেন কর্ত্তৃপক্ষের আনুকুল্য; যেন তাঁরা ছাড়া সমঝদার দর্শক আর ভূভারতে নেই! আর-আর সবাই তুচ্ছ ও সামান্য। এবং এই তুচ্ছ ও সামান্যর ভিতর থেকে যদি কোনো উৎসুক ও অধীর মেয়ে তাঁদের দিকে ঘেঁষে

এসে বসেছে তবে অশেষ লাঞ্ছনায় তাঁকে বাধ্য হয়ে স্থানত্যাগ করতে হচ্ছিল—সে লাঞ্ছনা ভঙ্গীতে, ইঙ্গিতে, অসুজন ব্যবহারে এবং অসুখকর বক্রোক্তিতে :

একপাশে বসেছিল সতীশের মা, একাকিনী মুখ বুজে। বাড়ী তার রাসবাগানে। সন্ধ্যার সময়ে ছেলেটার হাত ধরে' অনেকখানি পথ তাকে হেঁটে আসতে হয়েছে। ছেলেটার বয়স বছর সতেরো !

সতীশের মা'র বয়সও বেশি নয়। তিরিশ কি বত্রিশের বেশি বল্‌লে তার প্রতি অন্যায় হয়। বেশ মোটা-সোটা স্ত্রীলোক, শক্ত-সমর্থ, গায়ের রংটা একটু ফর্সা, মাথায় অনেক চুল। সবসুদ্ধ মন্দ নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ থেকে এমন একটা কানাকানি চলছে তাকে নিয়ে—চলছে ওই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের মধ্যে—যে, তাকে হয় ত এখুনিই স্থান ত্যাগ করে' অন্যত্র যেতে হবে। চলুক কানাকানি, উঠবে না সে এখান থেকে। তার অধিকার কারো চেয়ে কম নয়। সতীশের হাতটা চেপে ধরে' সে সেইখানে কঠিন হয়ে বসে রইল। বসে রইল যবনিকা উঠবার অপেক্ষায়।

কিন্তু সাহসটা ছিল মনে, চোখে ও মুখে নয়। মায়ের মতো ছেলের চোখও ভয়ে কুণ্ঠিত, সন্ত্রস্ত সতর্কতায় সজাগ। কানাকানিটা সতীশের কানেও বাজছিল তীরের মতো, অগ্নি-শলাকার মতো।

'আর কত দেরি মা ? চলো না হয় ওদিকে গিয়ে বসি।'

আশ্রয়

'বোস চুপটি ক'রে, ছটফট করিস নে।'

'তোমাকে দেখলেই গজ গজ করে ওরা।'

মা বললে, 'ওদের স্বভাব।'

আবার চুপচাপ। গোলমাল চলছে চারিদিকে। সাতটার সময় থিয়েটার আরম্ভ হবার কথা, এখন আটটা বাজে। ষ্টেজে আলো খাটানো হচ্ছে। মুখে রং মাখছে নাটকের পাত্রপাত্রীরা, কেউ পর্দ্দার আড়ালে স্ত্রীলোকের অঙ্গসজ্জা পরতে সুরু করেছে। এমন সমারোহের অভিনয় এ পাড়ায় এই প্রথম। রাত শেষ হয়ে গেলেও সবাই প্রতীক্ষা করে থাকবে।

শীতের রাত। পাল টানানো হয়েছে বটে কিন্তু তার একটা দিক খোলা। খোলা দিকটা দিয়ে হু হু করে' বাতাস আসছে। মাতা ও পুত্র গায়ে ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে বসে রয়েছে। প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেল।

কিন্তু গুঞ্জনটা থাম্‌ল না। কে একজন এই দিক দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল, একটি ভদ্র মহিলা তাকে বললেন, 'ও খগেন, আমাদের এদিকের একটা ব্যবস্থা করে' দিয়ে যাও বাবা।'

'কি বলছ পিসিমা?' ব'লে খগেনবাবু মেয়ের দলের সুমুখে হেসে দাঁড়ালেন। বিগলিত বিনয়ে একটু উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবার চেষ্টা করলেন।

'তুমিই পারবে বাবা' ব'লে পিসিমা স্পষ্ট ভাষাতেই বললেন, 'হিরণ্ময়ী যদি আমাদের পাশে বসে তবে আমরা সবাই উঠে যাবো।'

হিরণ্ময়ী মানে সতীশের মা ; এবং সতীশের মাকে চেনে না এমন মানুষ এ তল্লাটে নেই। চেনে অবশ্য নানা কারণে। খগেনবাবু বললেন, 'সে আমি কি করতে পারি পিসিমা, তোমরাই বলো না ? উনিও ত পাড়ার লোক, চাঁদাও দিয়েছেন।'

'কি যে বলিস খগেন, চাঁদা দিয়েছে বলেই বুঝি মুড়ি মিছরি একাকার হবে ? এ আমরা বরদাস্ত করব না বাবা, উঠে যেতে বলো তোমাদের হিরণ্ময়াকে। ঘরের বৌঝিরা এসেছে বাইরে, যদি তাদের একটা বদ্‌নাম রটে ?'

আর সব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা পিসিমার কথায় সায় দিলেন। খগেনবাবু চলে যাবার সময় ব'লে গেলেন, 'গোলমাল একটা হবে হয় ত, দেখি জ্যোতিষকে একবার ডেকে দিই।'

একজন মেয়ে বললেন, 'অসৎ সংসর্গে আমরা বসব না।'

সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল, চল্‌ল, কানাকানি। চিড়িয়াখানার অপরূপ জীবের মতো একপাশে বসে হিরণ্ময়ী সকলের দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে দাঁড়াল। ভদ্রঘরের মেয়ে সে, তবুও তার চরিত্রের অতীত ইতিহাসটা অনেকেই জানে ; কয়েকদিন পূর্ব্বে বোঝার উপর শাকের আটির ন্যায় আরো কি যেন একটা কলঙ্ক তার নামে পাড়াময় রাষ্ট্র হয়েছিল। ঝড় এখনো থামে নি।

সতীশ চুপি চুপি বললে, 'চলো মা, ওঠো।'

দাঁতে দাঁতে চেপে হিরণ্ময়ী বললে, 'মেরে খুন ক'রে ফেল্‌ব অস্থির হ'লে। চুপ ক'রে বসে থাক্।'

চুপ ক'রেই সতীশ বসে রইল বটে কিন্তু কানাকানিটা থামল না। পিসিমা অস্ফুট বিক্ষোভে বললেন, 'জানে না কে শুনি? জানতে কিছু বাকি আছে? গোলমাল হয়, ভয় করি নে কা'কেও—এক সঙ্গে তা বলে আমি বসতে দেবো না।'

আর একজন বললেন, 'ছেলেটাকেই বা আনা কেন? জোয়ান-মদ্দ ছেলেকে মেয়েমানুষের ভিড়ের মধ্যে ছেড়ে দেয়ই বা কোন্ সাহসে? এমন বেপরোয়া মেয়ে বাপু কোথাও দেখি নি!'

পিসিমা বললেন, 'আসুক জ্যোতিষ, নেয্য বিচার চাই। পাড়ার সবাই ত মরে নি এখনো—বলি ওগো ভাল মানষের মেয়ে, ছেলেটাকে নিয়ে কি ওদিকে গিয়ে বসা যায় না?'

হিরণ্ময়ী নির্ব্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'এখানে বসলেই বা ক্ষতি কি?'

'ক্ষতি কি বোঝবার মাথা তোমার নেই মা, আক্কেল-বিবেচনা তোমার চুলোয় গেছে। বলিহারী হিরণ্ময়ী, কত রঙ্গই দেখালি বাছা। দরদ ক'রে ছেলেটাকে এনেছিস সঙ্গে, তবু যদি সতীশ তোর পেটের ছেলে হোতো!'

হিরণ্ময়ীর আর সহ্য হোলো না। সতীশের হাতটা চেপে ধরে' বললে, 'বেশ ত, দাঁতের বিষ যতটা আছে আজ সব বের ক'রে দিন্ পিসিমা, এসেছি ত সবটা শুনেই যাই।'

পিসিমা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলেন—'আহা হা, কত ঢঙের কথাই জানিস মাইরি। লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে বেড়াবি, চোর বললেই যত

অপরাধ। এখানে গুটি গুটি আসা হয়েছে কেন শুনি? আবার কোন্ ছেলেটার মাথা খেতে? লজ্জা করে না? ভদ্দল্লোকের মেয়ে বলে' পরিচয় দিস্ কোন্ সাহসে?'

সতীশ বললে, 'ওঠো না মা?'

এমন সময় জ্যোতিষ এবং আরো একটি ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। পিসিমা প্রমুখ আর সবাই আপন আপন আবেদন পেশ করলেন। হিরণ্ময়ীর সহিত একাসনে একত্র বসতে কেউ রাজি নন্। আলাপ ও আন্দোলনের মাঝখানে দ্বিতীয় ঘণ্টাটাও বেজে গেল; এর পরের বেল্ বাজলেই অভিনয় আরম্ভ। জ্যোতিষ নিরুপায় হয়ে হিরণ্ময়ীর কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'হিরুদিদি, আমার অপরাধ নেবেন না। উঠে গেলে ওঁরা যদি খুসিই হন্ তা হলে······যদি গোলমাল একটা হয় তবে কেলেঙ্কারী—'

হিরণ্ময়ী বললে, 'এতই অনিষ্ট হবে আমি এখানে বসলে? আমারো ত একটা অধিকার আছে?'

হাত জোড় ক'রে জ্যোতিষ বললে, 'আমার কোনো অপরাধ নেই। দেখছেন ত, পিসিমা বড়ই একগুঁয়ে। আসুন আমার সঙ্গে, ওদিকে বেশ ভালো জায়গায় আপনাকে আর সতীশকে বসিয়ে দিচ্ছি। যারা তাড়াচ্ছে আপনাকে এখান থেকে, তাদের কাছে কোনো মানুষেরই দাম নেই। এ আপনার অপমান নয় হিরুদিদি।'

এমন কথার পর এখানে জোর করে' অধিকার খাটিয়ে আর

সে থাকা চলে না। হিরণ্ময়ীর জীবনে হয় ত সবই নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার ভদ্র মন এখনো মরে' যায় নি। এ যদি মরতো তবে সে আজ পিসিমাদের ক্ষমা করে' যেত না। জ্যোতিষের কথায় একটু হেসে সে সতীশের হাত ধরে' উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াবামাত্রই অন্য সব স্ত্রীলোকেরা অতি দ্রুত তাকে পথ ছেড়ে দিল—সবাই সতর্ক, পাছে তার মতো অসচ্চরিত্রকে অসাবধানে হঠাৎ ছোঁয়া যায়।

ভিড় থেকে বেরোতেই জ্যোতিষ বললে, 'আসুন আমার সঙ্গে—'

এমন সময় শেষ ঘণ্টা পড়তেই এবার চমৎকৃত ও বিমূঢ় দর্শকগণের সম্মুখে প্রথম যবনিকা উঠ্‌ল। সেই দিকে একবারটি তাকিয়ে হিরণ্ময়ী বললে, 'ভালো জায়গায় আর আমাকে বসাতে হবে না জ্যোতিষ, আমি ভাই চললুম। আয় সতীশ, আয় বাবা, অনেক রাত হয়েছে।'

সতীশের হাতটা ধরে' নির্ব্বাক জ্যোতিষের মুখের উপর দিয়ে আর কোনো দিকে না চেয়ে হিরণ্ময়ী অভিনয়ের আসর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

শীতের রাতে পথ ঘাট এরই মধ্যে নির্জ্জন হয়ে এসেছে। আশপাশে বাড়ীর দরজা সব বন্ধ। মা ও ছেলের মুখে একটিও কথা নেই। যেন স্বপ্নের ঘোরে তারা চলেছে। অনেক দূর এসে হিরণ্ময়ী একটা দোকান দেখে থমকে দাঁড়াল। বললে

রান্নাবান্না ত আজ হয় নি, দাঁড়া, চার পয়সার খাবার কিনে নি
যাই তোর জন্যে।'

আঁচলে বাঁধা ছিল পয়সা। হিরণ্ময়ী খাবার কিনে নিয়ে আবা
চলতে লাগল।

পথ বেশী দূর নয়। বাসায় পৌঁছে ঘরের তালা খুলে
আন্দাজে এক জায়গায় খাবারের ঠোঙা নামিয়ে রাখল। তারপ
দেশালাই খুঁজে জ্বাললে আলো। আলোয় সে সতীশের মুখে
দিকে তাকিয়ে বললে, 'ও কি, কাঁদচিস্ কেন রে? আ
আমার কাছে।'

অশ্রুপ্লাবিত মুখ তার গায়ের মধ্যে লুকিয়ে সতীশ ফোঁপাতে
লাগল। হিরণ্ময়ী তাকে আদর ক'রে বললে, 'অনেক সইতে হয়
বাবা, এখনো যে অনেক বাকি!'

রুদ্ধ কণ্ঠে সতীশ বললে, 'যে যাই বলুক, তুমি আমার মা।
বাপের পরিচয় আমি জানি নি, জানি তোমাকে।'

থাম্, আর পণ্ডিততাই করতে হবে না। বিছানা করে দিই,
খেয়ে দেয়ে ঘুমো।'

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা